কিশোর সংস্করণ

মনোজ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
মুদ্রাকর—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেংগল বাইণ্ডার্স

দু'টাকা

আগে এ অঞ্চলে বসতি ছিল না, পূর্বদিকে মালঞ্চ নদী আর উত্তর-পশ্চিমে ডাকাতের বিলের মাঝখানে পোড়ো মাঠ ধু-ধু করিত। এই মাঠের মধ্যে আসিয়া পাঁজা সাজাইলেন শ্যামশরণ চৌধুরি মহাশয়। শ্যামশরণের নামেই মাঠ আজ শ্যামগঞ্জ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শোনা যায়, শ্যামশরণ বিষম জেদি মানুষ ছিলেন। এক রাত্রে মশারি না পাইয়া মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাড়ি ছাড়িয়া যান, সে পৈতৃক বাড়িতে জীবনে আর পা দিলেন না। মায়ের মৃত্যুকালে—তখন শ্যামশরণ ধুমধাম করিয়া নগর পত্তন করিতেছেন—ভাইরা আসিয়া হাত-পা ধরিয়া কত কান্নাকাটি করিল, শ্যামশরণ নিশ্চল। মাথা নাড়িয়া বলিলেন, যাও তোমরা, ব্যস্ত হোয়ো না—দেখা হবেই। তা হইল বটে! মায়ের শব শ্মশানে নামাইলে দেখা গেল, মলিন অবসন্ন মুখে সকলের পিছনে শ্যামশরণ একলা বসিয়া কাঁদিতেছেন। চিতার আয়োজন হইতে লাগিল। যতক্ষণ না চিতায় তোলা হইল, শ্যামশরণ মৃতার পা দু-খানির তলায় মাথা গুঁজিয়া নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিলেন। চিতার আগুন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তারপর শ্যামশরণ আর সেখানে নাই।

আর আর ভাইরা পৈতৃক বাড়িতে সাধ্যমতো শ্রাদ্ধ-শান্তি করিল, শ্যামশরণ বিপুল সমারোহে নিজের বাড়ি দানসাগরের আয়োজন করিলেন, ভাইদের কারও ডাকিলেন না। ভাইরা নাছোড়বান্দা হইয়া ডাকাডাকি লাগাইলে বরকন্দাজ ডাকিয়া তাদের হাঁকাইয়া দিলেন—এমনও শোনা যায়।

রাত্রিবেলা এক কাপড়ে বাড়ি ছাড়িয়াছিলেন, তখন শ্যামশরণ একরকম শিশু বলিলেই হয়। আর একদিন হাঁকডাক করিয়া গ্রাম বসাইতে লাগিলেন, দেল-দোল-দুর্গোৎসবে অফুরন্ত টাকা খরচ করিতে লাগিলেন, দেশের মধ্যে ভয় ও সম্ভ্রমের অন্ত রহিল না। শ্যামশরণের তখন গোঁফে চুলে পাক ধরিয়াছে। লোকে বলিত, সাত ঘড়া সোনার মোহর তাঁর শোবার দালানের মেজেয় পুঁতিয়া তার উপর বিছানা পাতিয়া বুড়া ঘুমাইতেন। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে ঘরের দরজা-জানলা সমস্ত আঁটিয়া নিজের হাতে সাবলে মেঝের পাথর উঠাইয়া বুড়া ঘড়াগুলি বাহির করিতেন; সমস্ত রাত্রি ধরিয়া পাথরের উপর সোনার মোহর ঢালিতেন, তুলিতেন, চটুল হাসি হাসিতেন, আপনার মনে কত কথা বলিতেন, গল্প করিতেন…জানলায় কান দিয়া বুড়ার কোন কোন কর্মচারী একটু-আধটু তাহা শুনিতে পাইত। বৎসরের কেবল এই একটিমাত্র রাত্রি। পরদিন হইতে শ্যামশরণ আবার কঠোর রুক্ষ স্বল্পভাষী ভয়ানক মানুষটি। আর তিনশ' চৌষট্টি দিনের মধ্যে মুখে তাঁর তিলার্ধ বাচালতা নাই।

নিঃস্ব গৃহহারা গ্রাম্যশিশুর ভাগ্যে কি করিয়া অবশেষে এত সোনা জুটিল, সঠিক তাহা জানিবার উপায় নাই। কেউ বলে, রাজা প্রতাপাদিত্যের এক ভাঙা গড়ের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে দেয়াল ধ্বসিয়া তিনি মাটিতে পড়িয়া যান। হাঁটু ভাঙিয়া গেল, তারপর খোঁড়া পায়ে কোন গতিকে উঠিয়া দেখিতে পাইলেন, দেয়ালে পোতা সারি সারি কলসির মধ্যে সোনা ঝিকমিক করিতেছে।

আবার বলে, সেকালে মালঞ্চে আর ডাকাতের বিলে যত ডাকাতি হইত, তার সকল জিনিসপত্র বেচিয়া সকল গহনা গলাইয়া জমিয়াছিল নাকি শ্যামশরণের ঐ সোনা। একলা শ্যামশরণ নিজের দু-খানা হাতেই নাকি একশ-একটা মানুষ মারিয়া ডাকাতের বিলের হোগলা-কলমির দামের নিচে চালাইয়া দিয়াছিলেন।

সে যাই হোক, নগণ্য এক পথের ভিখারি কি করিয়াছিল, কি করিয়া বেড়াইত, কে-ই বা তার খবর রাখে! কিন্তু দালান-ইমারত সোনা-জহরতের মালিক শ্যামশরণকে একটি দিনও কেউ রাত্রে বাহির হইতে দেখে নাই। সন্ধ্যা হইতে না হইতে শোবার ঘরের চারিপাশে খুব উজ্জ্বল অনেক আলো জ্বালিয়া শ্যামশরণ দরজা আঁটিয়া দিতেন। সেই দিনের মতো আলোয় বাহিরে ঢালিরা ঢাল-সড়কি লইয়া সমস্ত রাত্রি টহল দিয়া ফিরিত। কিন্তু চৌধুরির শত্রুরা রটনা করে, একশ-এক সেই বিদেহী আত্মা তাদের হকের ধন পাছে কাড়িয়া লইয়া যায়, তাই তাঁর এ সতর্ক ব্যবস্থা।

রাতের পর রাত কাটিয়া যাইত, বুড়া কখনো ঘুমাইতেন না। বাহিরের ঢালিদের এক মুহূর্ত যদি ঝিমুনি আসিত, পদক্ষেপ ক্ষীণ হইয়া উঠিত, বজ্রকণ্ঠে বুড়া অমনি চিৎকার করিয়া উঠিতেন, কোথা ?

রাত্রির নিস্তব্ধতা সে বজ্রস্বরে কাঁপিয়া উঠিত। ঢালির খড়ম আবার চলিতে শুরু করিত, খট-খট-খট—

শ্যামশরণের মনের কথা হইত একটু-আধটু কেবল দয়াময় ঘোষালের সঙ্গে। দয়াময় ছিলেন দেওয়ান। একদিন দয়াময় বলিলেন, আপনি একটি বিয়ে করুন।

রুক্ষদৃষ্টি মেলিয়া শ্যামচরণ বলিলেন, কেন ?

সে দৃষ্টির সামনে একটু ঘাবড়াইয়া দয়াময় বলিলেন, মানে···আপনার অতুল ঐশ্বর্য দেখবে কে ? দু-একটা ছেলেপুলে না থেকে বাড়ি যেন আঁধার হয়ে আছে।

কেমন একধরনের অদ্ভুত হাসিতে শ্যামশরণের মুখ ভরিয়া গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিতেই লাগিলেন। তারপর বলিলেন, দু-একটা নয় দয়াময়, আমার সাত-সাতটা ছেলে। আবার বলিলেন, তারা আমার ঘর আলো করে রয়েছে—দেখবে ? একদিন দেখিয়ে দেব তোমায়।

সে দেখানো কোনদিন হইয়াছিল কিনা, কে জানে! তখন হাসিয়া দয়াময়ের কথাটা উড়াইয়া দিলেন বটে, কিন্তু শ্যামশরণের মুখের হাসি বেশিক্ষণ থাকিল না। মনে নিরন্তর ঐ ভাবনাটাই কাঁটার মতো ফুটিতে লাগিল, তাঁর অবর্তমানে এ বিপুল স্বর্ণ রক্ষা করিবে কে? রাতের ঘুম তো ছিলই না, দিনের কাজকর্মও অতঃপর সমস্ত ঘুচিয়া গেল। দিন-রাত ভাবিয়া ভাবিয়া শ্যামশরণ এক অতি ভীষণ বিচিত্র সঙ্কল্প করিলেন।

(২)

ডাকাতের বিলে আজকাল অজস্র পদ্ম ফুটিয়া থাকে, সেকালের মতো গভীর জল নাই, জলে ঢেউ নাই, জলের চেয়ে ইদানীং পাঁকই বেশি। বড় নৌকার পথ নাই—ডিঙি ও ডোঙা চলে মাঝে মাঝে। আর বারো মাসই নানারকম ফুলে বিল আলো হইয়া থাকে—কলমিফুল, সাপলাফুল, কেউটেফণার ফুল, লাল ও সাদা রঙের বড় বড় পদ্ম—যেন তার সীমা নাই, দৃষ্টি যতদূর যায় কেবল ঐ ফুলের সমুদ্র।

ঐ ডাকাতের বিলের প্রান্তে—শ্যামশরণ মাটির নিচে সারি সারি সাতটা পাথরের কুঠারি তৈয়ারি করিলেন, দরজাগুলা তার লোহার। শ্যামশরণের বাড়ির কোন্ একটা গোপন জায়গা হইতে সুড়ঙ্গ আসিয়া সেই সাত দরজার মুখে লাগিয়াছে। সে-সুড়ঙ্গের মুখও পাথরে বাঁধানো, বাহির হইতে দেখিয়া কিছুই টের পাইবার জো নাই।

এত সব কাণ্ড হইয়া গেল, কতদিন ধরিয়া কত লোকজন খাটিল, অথচ বাহিরে কাক-পক্ষীতেও টের পাইল না। এই কাজে দয়াময় ঘোষাল নাকি দশ ক্রোশ বিশ ক্রোশ দূর হইতে রাতারাতি রাজমিস্ত্রি আনিয়াছিলেন। নৌকা বহিয়াছিল শ্যামশরণের যৌবন-দিনের সাকরেদরা—গলা কাটিয়া তাদের মারিয়া ফেলা যায়, কিন্তু কথা বাহির হয় না। মিস্ত্রিদের অন্দর মহলে ঢুকাইয়া দিয়া দয়াময়

খালাস। তারপর শ্যামশরণ নিজের হাতে একটি একটি করিয়া সমস্ত দরজা-জানলা আঁটিয়া দিলেন, বাহিরে ক্ষীণতম শব্দটিও আসে না। মাসখানেক পরে আবার এক রাত্রিবেলা সেই দরজা খুলিয়া গেল। উঠান জুড়িয়া পড়িয়া রহিয়াছে মিস্ত্রিগুলার লাস; কাজের শেষে তারা বখশিশ পাইয়াছে। দরজা খুলিয়া শ্যামশরণ ইঙ্গিত করিলেন। মালঞ্চে তখন ভরা জোয়ার, বিপুল স্রোত। গরুর গাড়ি বোঝাই লাস ঢালা হইল সেখানে। সেই স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া হতভাগারা বোধকরি বা নিজ দেশেই ফিরিয়া চলিল। দয়াময় ঘোষাল আগাগোড়া অন্দরবাড়ি খুঁজিয়া দেখিলেন, আরও অনেকে দেখিল—আশ্চর্য! মিস্ত্রিগুলা এতদিন ধরিয়া যে কি করিল, কোনখানে একবিন্দু তার খোঁজ পাইবার জো নাই। অবিকল সেই আগেকার উঠান, একটি পাথরের কণিকা কোথাও খসে নাই, দেয়ালের জমাটে ক্ষীণতম রেখাটি পড়ে নাই। সুড়ঙ্গের গোপন মুখ জগতের মধ্যে জানিয়া রাখিলেন একমাত্র শ্যামশরণ।

গ্রীষ্মকাল। দুপুরবেলা আকাশ হইতে যেন আগুন-বৃষ্টি হইতেছে। এমন সময় একদিন এক ব্রাহ্মণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া শ্যামশরণের অতিথি-শালায় উঠিলেন, সঙ্গে বারো বছরের ফুটফুটে নধর গোছের একটি ছেলে। এত পথ রৌদ্রে হাঁটিয়া ঘামিয়া ছেলেটির কচি-মুখখানা জবাফুলের মতো টকটক করিতেছে। শ্যামশরণ তাড়াতাড়ি হাঁক-ডাক করিয়া বাড়ির মধ্য হইতে তরমুজের শরবৎ আনাইয়া বাপ-ছেলেকে খাওয়াইলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতে বেলা প্রায় পড়িয়া আসিল। অচেনা পথ-ঘাট, সামনে অন্ধকার রাত্রি—সেদিন রাত্রিটাও ঐখানে কাটাইয়া দেওয়া হইবে, এই রকম সাব্যস্ত করিয়া শ্রান্ত ব্রাহ্মণ ছেলে লইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুম যখন ভাঙিল, তখন ঘোর হইয়া গিয়াছে। ছেলে পাশে নাই। কোথায় গেল? কোথায় গেল? কেউ সে খবর দিতে পারে না। আগে ভাবিয়াছিলেন, কোথায় হয়তো কোন এক ছেলের দলের সঙ্গে ভাব করিয়া খেলাধুলায় মাতিয়াছে।

কিন্তু রাত্রি গভীর হইল, ছেলের সন্ধান নাই। বাপ শেষে পাগলের মতো হইয়া উঠিলেন। আর আর যারা খুঁজিতে গিয়াছিল, অবসন্ন হইয়া তারা ফিরিয়া আসিল। সমস্ত রাত্রি কেবল একটি লণ্ঠন হাতে বিপন্ন ব্রাহ্মণ অশ্রান্ত কণ্ঠে ডাকিয়া ডাকিয়া ফিরিলেন।

তখন ছেলে রুদ্ধদ্বার পাতালপুরীতে—বাপের ডাক সেখানে পৌঁছে না। শ্যামশরণ মাটির নিচে পাষাণ-কক্ষে কোমল করিয়া শয্যা বিছাইয়া রাখিয়াছিলেন, টানিতে টানিতে সোনা-বোঝাই একটা ঘড়া আনিয়া এখন শয্যার শিয়রে রাখিলেন। তারপর ঘুমন্ত ব্রাহ্মণ-শিশুকে সুড়ঙ্গ-পথে লইয়া গিয়া সেখানে শোয়াইয়া যেই পিছু ফিরিয়াছেন, অমনি আলো-বায়ুহীন কক্ষের মধ্যে বোধকরি বা নিশ্বাস ফেলিবার কষ্টেই বালক জাগিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। দ্রুত ছুটিয়া বাহির হইয়া শ্যামশরণ ঘড়াং করিয়া লোহার দরজা বন্ধ করিলেন। তারপর কান পাতিলেন, শব্দ কিছুই বাহিরে আসিবার ফাঁক নাই। কিন্তু বুকের মধ্যে সেই সদ্য-জাগ্রত অসহায় বালকের আর্তকণ্ঠ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। একটু স্থির থাকিয়া তারপর সুড়ঙ্গ ধ্বনিত করিয়া উন্মাদের মতো শ্যামশরণ হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, জেগেছিস? বেশ, বেশ বাবা, জাগলি তো খুব সজাগ হয়ে ঘড়া আগলে বসে থাক। যে নজর দেবে একটা মোচড় দিয়ে তার ঘাড় ফিরিয়ে দিবি অন্যদিকে—

দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া একলা এমনি হাসিয়া আবার শ্যামশরণ সহজ সাধারণ মানুষ হইয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন।

ছেলে-ধরার ভয়ে ও-অঞ্চলের মানুষ তখন আর ছেলেপেলে ঘরের বাহির হইতে দেয় না, দিন-রাত চোখে চোখে সামাল করিয়া রাখে। তবু এমনিভাবে আরও ছয়-ছয়টা ব্রাহ্মণ-বালক চুরি হইয়া গেল। পৃথিবীর নিরন্ধ্র তলদেশে না খাইয়া তৃষ্ণায় শুকাইয়া দিনের পর দিন কঙ্কালসার হইয়া অবশেষে সেই কঙ্কাল গলিয়া পচিয়া গুঁড়া হইয়া কি প্রক্রিয়ায় যে অবশেষে পাতাল-রাজ্যের ধন-রক্ষক

হইয়া দাঁড়াইল, কে জানে! কিন্তু সাতটা যক্ষ দিনরাত সজাগ থাকিয়া ডাকাতের বিলের কাছাকাছি কোন এক অনির্দেশ্য জায়গায় শ্যামশরণের বিপুল ধন বহুকাল পাহারা দিয়া বেড়াইয়াছে, এ কাহিনী অবিশ্বাস করিবে তেমন মানুষ তখনকার দিনে এ অঞ্চলে একটা জন্মে নাই।

আরও মাস কয়েক ঘুরিয়া আবার কোজাগরী পূর্ণিমা আসিল—পরিষ্কার মেঘশূন্য রাত্রি। এ রাত্রে বিজন কক্ষে শুইয়া শুইয়া শ্যামশরণের ঘুম আর আসে না। কোথায় অনেক দূরে মাটির সুগভীর নিম্নে অবরুদ্ধ কক্ষতলে সাত ঘড়ার সকল সোনা ঝনঝন করিয়া বাজিয়া যাইতেছে, সাতটি সোনার শিশু সারা বৎসরের অন্ধকারের মধ্যে কত কান্না কাঁদিতেছে! অনেকক্ষণ ছটফট করিয়া অনেক ইতস্তত করিয়া শ্যামশরণ অবশেষে নিষুপ্ত মধ্যরাত্রে দ্বার খুলিলেন। ইদানীং বাহিরে ঢালির পাহারা বন্ধ, পাকা পাহারার বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে—মানুষের আর প্রয়োজন কি? জ্যোৎস্নালোকিত জনহীন উঠানের প্রান্তে গুপ্ত সুড়ঙ্গের দ্বারে দাঁড়াইয়া কম্পিত হস্তে শ্যামশরণ একটা মশাল জ্বালিয়া লইলেন, তারপর পাথর সরাইয়া ধীরে ধীরে সোপান বহিয়া পাতালে নামিয়া গেলেন। এমনি কতদূর চলিয়াছেন—দপ করিয়া হঠাৎ মশাল নিভিল, দম আটকাইয়া আসিল, অন্ধকারের মধ্যে কে যেন লোহার মতো ভারী হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া গুঁড়াইয়া দিতেছে। শ্যামশরণের চেতনা-লোপ হইয়া আসিল, তাহারই মধ্যে একবার উপরের দিকে তাকাইলেন। জ্যোৎস্নার যে ক্ষীণ রশ্মি সুড়ঙ্গের প্রবেশপথে ঢুকিয়াছিল, কোথাও তার একবিন্দু চিহ্ন নাই। সর্বনাশ! পাথর পড়িয়া গিয়া মুখ ইতিমধ্যে কখন আটকিয়া গিয়াছে, বাহিরের বাতাসের ঢুকিবার ফাঁক নাই। অতদূর উঠিয়া আসিয়া কাঁধে তুলিয়া মুখের সে পাথর সরাইয়া দিবেন, সে শক্তি শ্যামশরণের নাই। মুখ থুবড়াইয়া সেইখানে তিনি পড়িয়া গেলেন। সেই রাত্রে সোনার প্রহরী সাত যক্ষের সঙ্গে মিতালিটা তাঁর কি রকমের হইল, বাহিরের মানুষ কোনদিন তার তিলার্ধ জানিতে পাইল না।

(৩)

শ্যামশরণের ভায়েদের বংশের একজন নরহরি চৌধুরি।

গুপ্ত স্থড়ঙ্গের খোঁজে নরহরি তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছেন। উঠানের সমস্ত পাথর খুঁড়িয়া তোলাইলেন, দেয়ালের এখানে-ওখানে সন্দেহ করিয়া কতবার ভাঙাভাঙি করিলেন, বছরের পর বছর কত চেষ্টা হইল, সোনার মোহরের একটি কণিকা মিলিল না।

মিলিবে কেমন করিয়া? শ্যামশরণের সে সোনা কি আছে, চাঁদামাছ হইয়া মালঞ্চের স্রোতে কবে ভাসিয়া গিয়াছে! দুষ্ট ছেলে-মেয়েরা যখন ঘুমাইতে চাহে না, মায়েরা এই গল্প করিয়া ঘুম পাড়াইয়া থাকেন। এই মায়েদের মায়েরাও একদা এই গল্প করিয়া গিয়াছেন।

শ্যামশরণের মৃত্যুর অনেক বছর পরের কথা। একদিন খর দুপুরে জনমানবহীন বিলের প্রান্তে হঠাৎ পাতাল ভেদ করিয়া সাত যক্ষ মাটির উপরে উঠিয়া বসিল। সাতটি বড় বড় মলিন পিতলের কলসি—কিন্তু জীবন্ত চলনশীল। যক্ষেরা উঠিয়া বসিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া রহিল না—গড়াইতে গড়াইতে ধীরে ধীরে মালঞ্চের দিকে চলিল। এক বুড়ি ওদিককার গ্রামে দুধ বেচিতে গিয়াছিল। দুধ বেশি বিক্রয় হয় নাই, ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিতেছিল—মাঠের মধ্যে অপরূপ ব্যাপার দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। আরও আশ্চর্য কাণ্ড, যক্ষ বুড়িকে ডাকিয়া কথা বলিল। সকলের আগে যেটি চলিতেছিল, তার সেই কলসির দেহ হইতে মিষ্টি রিণরিণে ছেলেমানুষের করুণ আওয়াজ বাহির হইল, তেষ্টা পেয়েছে বুড়ি-মা, দুধ দাও—খাই। বুড়ির বিস্ময়ের ভাব তখন একরকম কাটিয়া গিয়াছে—কি করি কি না করি, মনের অবস্থাটা এই রকম। কলসির মধ্য হইতে পুনশ্চ কথা আসিল, মুখে ঢেলে দাও না একটু দুধ। সাত-পাঁচ ভাবিয়া

বুড়ি একপো দুধ মাপিয়া কলসির মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া বলিল, দাম? কলসি বলিল, আমার পিছে যে আসছে দাম দেবে সে-ই। পরের জন আগাইয়া আসিলে বুড়ি বলিল, বাবা আমার একপো দুধের দাম? সে বলিল, আমার পিছে। এমনি করিতে করিতে সবার শেষের কলসি বলিল, আমার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দাও—একেবারে দু-হাতে যত সোনা ধরে নিয়ে নাও। আনন্দে বুড়ি কি করিবে ভাবিয়া পায় না। কোঁচড় পাতিয়া তাড়াতাড়ি দু-হাত ভরিয়া সোনা একবার তুলিল। আবার ভাবিল, এত সোনা রয়েছে, নিই না আর একবার— কি আর হবে! আর একবার যেই হাত ঢুকাইতে গেছে, কলসি গড়াইয়া অমনি তার ঘাড়ের উপর আসিল। বুড়ি পড়িয়া গেল, কলসির কানায় তার নাক দুই খণ্ড হইয়া গেল। কোঁচড়ের দিকে তাকাইয়া দেখে, সমস্ত সোনা চাঁদামাছ হইয়া লাফাইতে শুরু করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে মাঠের উপর দিয়া অনতি-গভীর খাল নামিয়া গেল। সাতটা যক্ষ উপুড় হইয়া সমস্ত সোনা ঢালিয়া দিল, সোনা চাঁদামাছ হইয়া লাফাইতে লাফাইতে খালে পড়িল, বুড়ির আঁচলের গুলাও পড়িয়া গেল। সে খাল আজও আছে—নাককাটির খাল উহার নাম। নরহরির রান্নাবাড়ির পাশ দিয়া বাদাম-বনের ছায়ায় ছায়ায় মালঞ্চে গিয়া পড়ে।

(৪)

কালীর কিঙ্কর নরহরি।

মাসের মধ্যে যে কয়টা দিন নরহরি বাড়ি থাকিতে পারেন, সকালবেলা রঘুনাথ ঢালির সঙ্গে কুস্তি লড়েন, মাটি মাখিয়া বেলা দেড় প্রহর অবধি বসিয়া থাকেন, দু-জনে। বিকালে ওস্তাদ চিন্তামণি দলসুদ্ধ সকলকে লাঠি-সড়কির তালিম দেয়। সন্ধ্যার পর কালীর গানের আসরও বসে কখন কখন। জনশ্রুতি, অমাবস্যার নিশিরাত্রে শ্মশানেঘাটে গিয়া বার কয়েক নরহরি শব-সাধনার চেষ্টা

করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু উপযুক্ত গুরুর অভাবে সাধনা বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই।

শ্যামশরণের যখন জমজমাট অবস্থা তিনি সেই সময়ে এক মন্দিরের ভিত্তি গাড়িয়াছিলেন। নরহরি উহা শেষ করিতে লাগিয়া গেলেন। মন্দিরে কালী-প্রতিষ্ঠা হইবে।

সোনা খুঁজিয়া খুঁজিয়া নাজেহাল, তবু তিনি লোভ ছাড়েন নাই। এখন আর পাষাণ-প্রাসাদের মধ্যে নয়—যে নদী-খালের জলে সোনা মাছ লইয়া চরিতেছে, সেই জলের উপর ঘুরিয়া বেড়ান সোনার খোঁজে। কিছু পাইয়াছেনও নিশ্চয়, নহিলে হঠাৎ অবস্থা এমন ভাল হইয়া উঠিল কিরূপে? সম্প্রতি এক ভাল কারবার ফাঁদিয়াছেন—ধান-চাল কেনা-বেচা। আরও নাকি কোন কোন কারবার আছে। তার কতক লোকে জানে, কতক বা রটাইয়া বেড়ায়। কালীর করুণায় এসব হইতেছে—সঙ্কল্প করিয়াছেন, মন্দির-প্রতিষ্ঠা হইয়া গেলে প্রতি অমাবস্যায় বিপুল সমারোহে সেখানে কালীপূজা হইবে।

ইদানীং কাহন পনের ধান লইয়া নরহরি বড় মুশকিলে পড়িয়াছেন। ধানটা গত বছরের কেনা। গোলা বোঝাই পড়িয়া আছে, পোকায় খাইয়া তুষ করিয়া দিতেছে, কাটাইয়া দিবার নিতান্ত গরজ। কিন্তু ব্যাপারিরা দেখিয়া মুখ সিটকায়। বলে, ও-ধানের কাহন পাঁচ টাকার বেশি দেওয়া যাবে না।

নরহরির মুখে ব্যাপারির প্রস্তাব শুনিয়া রঘুনাথ সজোরে ঘাড় নাড়ে।

না চৌধুরি মশায়, ষোল টাকা পড়তা পড়েছে—কি হবে পাঁচ টাকায় বেচে? ও পোকার পেটেই যাক, খেয়ে বাঁচুক পোকামাকড়। তাতে পুণ্যি আছে।

নরহরি বলেন, না হে—দিয়ে দাও ঐ পাঁচ টাকায়। ডাক ব্যাপারিদের। কালীর করুণা থাকে তো পাঁচই ঘুরে ফিরে পঁচিশ হয়ে সিন্দুকে উঠবে।

দুপুরবেলা ব্যাপারিরা ধান ঝাড়িয়া বস্তাবন্দি করিয়া নৌকায় তুলিল। সন্ধ্যার পর দেখা গেল, সেই বস্তাগুলিই আবার ডিঙা বোঝাই হইয়া নাককাটির

খালের মোহানার দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। কিনারায় কসাড় গেঁয়োবন। তার মধ্যে অনেকক্ষণ হইতে একটানা একটা শব্দ হইতেছে—টু-টু-টু! শুনিলে মনে হয়, অসহায় কোন পাখীর ছানা আঁধারে মাকে খুঁজিয়া পাইতেছে না। কাতর হইয়া ডাকাডাকি করিতেছে।

ডিঙা প্রাণপণে লগি ঠেলিয়া সেই গেঁয়োবনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। পাখীর ছানার ডাকও সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দ। নরহরি অপেক্ষা করিতেছিলেন, অন্ধকারে তাঁর চোখ দুইটি জ্বলিতেছিল। ডাকিলেন, রঘুনাথ!

রঘুনাথ ডিঙা হইতে লাফাইয়া পড়িল। বলিল, কিছু বেগ পেতে হয় নি চৌধুরি মশায়। ওস্তাদ সড়কি উঁচিয়ে দাঁড়ালেন, আমি একটা বাড়ি কষে দিলাম ব্যাপারির মাথায়। জোরে নয়, আস্তে—মোলায়েম করে। হাউ-হাউ করে সব বেটা কেঁদে উঠল। হুকুম করতেই তারা চরের উপর এক-হাঁটু জলে নেমে দাঁড়িয়ে শীতে আর ভয়ে হি-হি করে কাঁপতে লাগল। ধীরে সুস্থে ডিঙিতে মাল তুলে নিয়ে এই আসছি।

ওস্তাদ চিন্তামণি এখন একেবারে ভালমানুষ হইয়া ডিঙার গলুয়ে বৈঠা ধরিয়া বসিয়াছিল। সে হাসিয়া বলে, নৌকোয় উঠে তারা ঝপাঝপ উল্টোমুখো উজান ঠেলে ছুটেছে। জন্মে আর এ পাইতক্কে আসবে না, চৌধুরি মশায়।

বেশ, ভালো! নরহরি রঘুনাথের পিঠে জোরে থাবা দিলেন। বলিলেন, ইদিকে আমিও বসে ছিলাম না—মহাদেব সা'র সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক করে ফেলেছি। প্রথমটা কিছুতেই রাজি নয়। বলে, জল-পুলিশের হাঙ্গামা। শেষকালে অবশ্য রাজি হল, কিন্তু কাহন দিতে চায় মোটে তিন টাকা হিসাবে।

রঘুনাথ আশ্চর্য হইয়া বলে, তিন টাকায় এক কাহন ধান?

নরহরি বলেন, বাস্তু-ঘুঘু যে বেটা! দু-কথায় আঁচ পেয়ে গেছে, জুত পেয়ে দাও মারছে।

তারপর গম্ভীর হইয়া বলেন, তাই সই। ক্ষতি কি আমাদের? কালীর করুণায় এই রকম ছু-তিন বার হাত-ফিরতি হলেই পুষিয়ে যাবে। খাটনিটা বেশি হচ্ছে, কিন্তু দিনকাল খারাপ পড়ে গেছে—কি করা যাবে বল?

জোয়ার আসিল একটু পরেই। গেঁয়োগাছের হাত দেড়েক অবধি ইহারই মধ্যে জলে ডুবিয়া গিয়াছে, ডালের গায়ে নদীজল ছলছল করিতেছে। মহাদেব সা'র মহাজনি ভাউলে দেখা দিল। প্রকাণ্ড নৌকা—মাঝি-মাল্লা দিয়া পনের-ষোল জন হইবে, তার কম নয়। ঘস্‌স্‌ করিয়া নৌকা চরে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে মহাদেব লাফাইয়া পড়িল দূর-বিস্তৃত নোনা-কাদার উপর। খালের মধ্যে অলক্ষ্য কোন জেলেদের উদ্দেশে সে হাঁক দিয়া বলে, মাছ কিছু পড়ল নাকি বেড়জালে? চাট্টি মাছ দেবে, ও ভাই? ডাল-ভাত খেয়ে তো পারা যাচ্ছে না।

আসিতেছে, মাছ আসিতেছে বই কি—দেখা যাইতেছে ঐ তো! ছায়ামূর্তির মতো নরহরি গেঁয়োবনের বাহিরে আসিলেন, আসিয়া মহাদেবের নৌকায় উঠিলেন। ফিসফিস কথাবার্তা—অন্ধকারের মধ্যে টাকা বাজিবার মৃদু আওয়াজ। তারপর নৌকার কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া নরহরি নামিয়া গেলেন। মাছ আসিয়া পড়িবে এইবার। মালঞ্চের নির্জন চরে নক্ষত্রের মৃদু আলোয় অতি নিঃশব্দে গেঁয়ো-জঙ্গল হইতে বস্তার পর বস্তা আসিয়া উঠিল মহাজনি নৌকায়। মহাদেব খুশি মনে নৌকা ছাড়িতে হুকুম দিল। ছপছপ চারিখানা দাঁড় মেলিয়া জোয়ারের সঙ্গে মন্থরগতিতে নৌকা চলিল।

নরহরি ও রঘুনাথ বাঁধের উপর। একদৃষ্টে নরহরি তাকাইয়া আছেন। বাঁকের মুখে নৌকা অদৃশ্য হইল। দাঁড়ের আওয়াজ মৃদুতর হইতেছে। ক্রমশ তাহাও মিলিয়া গেল।

রঘুনাথ গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল। এই রাতেই?

গম্ভীর কণ্ঠে নরহরি বলিলেন, হুঁ—

দু-জনে ডিঙায় উঠিলেন। মাঝির জায়গায় বসিয়া চিন্তামণি। রঘুনাথ বলিল, ওদের পাছু লাগতে হবে, ওস্তাদ—

তারপর নিচুগলায় চিন্তামণিকে বোঝাইতে লাগিল, কি অন্যায় দেখ—তিন টাকা-করে কাহন কিনে নিয়ে গেল। কালকে শোলাদানার হাট—হাটে যদি ওর থেকে দু-পাঁচটা বস্তাও বেচে ফেলে, পোষানো যাবে না।

চিন্তামণি ভাল-মন্দ কিছু বলিল না, লগির ঠেলা দিয়া ডিঙা জঙ্গলের বাহিরে আনিল। বারকয়েক বৈঠা বাহিয়া সহসা থামিয়া গেল। নরহরির দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, এটা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু। জল-পুলিসের কড়া নজর—কোথায় কোন বাঁকে ঘাপটি মেরে আছে, পাছু লাগলে সন্দ করবে।

রঘুনাথ বলিল, আগে মেরে ওঠ তা হলে। ওরা শোলাদানার হাটে চলেছে। ভীমখালির ঘাটে নৌকো বেঁধে খাওয়া-দাওয়া করিগে আমরা। ওরা পৌঁছে গেলে তখন বোঝাপড়া হবে।

নরহরি গুম হইয়া ছিলেন, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, না, কাজ-কারবার চলবে না এমন করে। ব্যাপারিগুলো কি রকম—ষোল টাকার মাল তিন টাকায় নিয়ে যায়, এটা তো বুঝে দেখবে না পুলিশ-বেটারা।

ছয় বৈঠা একসঙ্গে পড়িতেছে, ডিঙা তীরবেগে চলিয়াছে। রঘুনাথ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, হাত-ফিরতি এমন কতবার চলবে চৌধুরি মশায় ?

বিরস মুখে নরহরি বলিলেন, চলা না চলা আমাদের হাত নয়, ব্যাপারি মশায়দের দয়া। যতক্ষণ পড়তায় না পোষাবে, এই রকম চলবে। ব্যবসা করতে বসে লোকসান দিয়ে মরতে পারি নে তো !

চিন্তামণি বলে, কিন্তু যা বললাম চৌধুরি মশায়, ওঁয়াদের নজর পড়ে যাচ্ছে। আজ সকালে নিজের চোখে দেখেছি, কার্তিকদ'র কাছে তিনখানা বোট বাঁধা।

নরহরি বলিলেন, ওসব শুনে আর করব কি—দেখে শুনে সামাল হয়ে কাজকর্ম করতে হবে। সাধ করে কি এত ঝঞ্ঝাট পোহাচ্ছি ? এই শ্যামগঞ্জে মাল

তুলে দিলাম, বরাপোতায় খালাস হল। তেঘরার জঙ্গলে মাল বোঝাই হল, খালাস হবে গিয়ে ভীমখালিতে। আবার কোথায় না জানি কাল বোঝাই দিতে হবে! ব্যাপারিরা একটু বিবেচনা করলে এত সব কে করতে যেত বল, ওস্তাদ?

ভীমখালির ঘাটে দোকান আছে একটা। ভাল দোকান। চাল-ডাল নুন-লঙ্কা সমস্ত মিলিল, মিলিল না কেবল তেল-ঘি কোনটাই। ঘি কোন দিনই থাকে না, ঘি খাইবার লোক এ অঞ্চলে নাই। তেলটা ফুরাইয়া গিয়াছে আজ দু-তিন দিন মাত্র, গঞ্জ থেকে আনাইয়া লইতে হইবে। দোকানদার অভয় দিয়া বলিল, দিন আষ্টেকের মধ্যেই এসে পড়বে মশায়।

রঘুনাথ খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিল। বলে, হিসেব করে নাও দিকি ওস্তাদ, ফি জনের আধসের হিসাবে। চৌধুরি মশায় খাবেন না, তাঁকে বাদ দাও। উনুন খুঁড়ে খিচুড়ি চাপিয়ে দিতে হবে এক্ষুণি। তোফা হবে।

তোফা খিচুড়ির আয়োজন হইতে লাগিল। দোকানদার বাসন ধার দিয়াছে, বটতলায় রান্না চাপানো হইয়াছে। রঘুনাথের হাতে খুন্তি—প্রধান পাচক সে-ই। আর জন আষ্টেক উনুন ঘিরিয়া বসিয়াছে, সবাই রান্নার উপদেশ দিতেছে। কেউ বলে, জল দাও; কেউ বলে, ঝাল দাও; কেউ বা বলে, নুন কম হয়ে যাবে কিন্তু। সবাই তো সড়কি চালায় আর নৌকা বায়—তার মধ্যে এ বিদ্যায় কবে বিশারদ হইয়া বসিল, সেইটা সমস্যার বিষয়।

নরহরি ইহাদের মধ্যে নাই, একাকী ডিঙার উপর বসিয়া।

কিছুক্ষণ হইতে মেঘ জমিতেছিল। চরিদিকে গাঢ় আঁধার। রঘুনাথ খুন্তিতে খিচুড়ি তুলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল। মহা স্ফূর্তিতে বলিয়া উঠিল, পাতা পেতে ফেল, আর দেরি নেই। সারবন্দি বসে পড় সবাই।

সবে পাতার উপর খিচুড়ি পড়িয়াছে। এমন সময়—বিধাতা বিমুখ—ঝুপ-ঝুপ করিয়া বৃষ্টি আসিল। ডিঙাতেও ছই নাই। পাতার উপর হাত ঢাকা

দিয়া সকলে এদিক-ওদিক তাকাইতেছে। দোকানের মধ্যে অতি সঙ্কীর্ণ জায়গা, এত লোকের সেখানে সুবিধা হইবে না।

রঘুনাথ বলিল, ভাবিস কি, টপাটপ খেয়ে নে। বৃষ্টি পড়ছে—সে তো ভালই—ঐ জল মিশে যাচ্ছে, আলাদা করে আর জল খেতে হবে না।

সে-যা হয় একরকম হইত, কিন্তু বিপদের উপর বিপদ—নরহরি সেই মুহূর্তে হাঁক দিয়া উঠিলেন, গোন লেগেছে রে। শিগগির আয় সব, ডিঙি ছাড়তে হবে। এক্ষুণি—এক্ষুণি—

বৃষ্টির ছাট উপেক্ষা করা চলে, কিন্তু নরহরির হাঁক না শুনিয়া পারিবার জো নাই। যে যতটা পারিল, খিচুড়িতে মুখ ভরতি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দুই চক্ষের দৃষ্টি পুঞ্জিত করিয়া রঘুনাথ দেখিল, সত্যই অনেক দূরে একেবারে ওপার ঘেঁসিয়া গতিশীল একটি কালো রেখা—

ওপারে গ্রাম। গাছপালা জলে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তারই তলে যখন আসিয়া পড়ে নৌকা একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়, ফাঁকায় আসিলে মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্নায় আবছা একটি রেখার মতো আবার নজরে আসে। স্পষ্ট কিছু বুঝিবার জো নাই। ছপ-ছপ করিয়া ছ-খানা বৈঠা পড়িতেছে। ডিঙা দুলিতে দুলিতে ছুটিল। নরহরির চোখে পলক নাই। বলিতেছেন, জোরে—আরও জোরে, শব্দ-সাড়া না হয়—হাত চেপে বৈঠা চালাও। ঐ যে সামনে—চলো—

সামনে এমন ঝুঁকিয়াছেন যেন জল না হইলে ডিঙার অনেক আগে ছুটিয়া চলিয়া যাইতেন তিনি। নৌকার পিছু ধরিয়া ডিঙা চলিল। দু-বাঁক তিন-বাঁক এমনি চলিল। কোন রকমে সুবিধা হয় না—লোকের সাড়া আসিতেছে, হাটুরে লোক নদীতীরের পথে ফিরিতেছে। গ্রামের পর গ্রাম চলিয়াছে। অবশেষে তারা ফাঁকায় আসিয়া পড়িল। দু-পারেই দিগন্তব্যাপ্ত বিল।

চিন্তামণি তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়া বলিল, আরে রঘুনাথ, মহাজনি ভাউলে কোথা? এ যে হল বজরা—

রঘুনাথ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উঁহু···ঐ দেখুন—ঐ যে উঁচুতে হাল ধরে আছে।

চিন্তামণি বলে, হাল না হাতী। ও হল পালের বাঁশ। চোখের মাথা খেয়ে বসেছ এর মধ্যে ?

নরহরিও দেখিয়া বলিলেন, না রঘুনাথ, মহাদেব সা'র নৌকো এ নয়। ভুল করে আমরা এদিকে এসে পড়েছি—এসেছিও অনেকটা দূর। সে নৌকো খাল দিয়ে এতক্ষণ বারোবেঁকিতে পড়েছে।

নিশ্বাস ফেলিয়া নরহরি চুপ করিলেন।

রঘুনাথ বলে, না-ই বা হল মহাদেবের নৌকো। বজরা তো বজরাই সই! এদ্দূর যখন এসেছি, কারবারে লোকসান হতে দেওয়া হবে না। কি বলিস রে তোরা সব ?

হাঁ-হাঁ করিয়া প্রায় সকলেই সায় দিল। এত পথ পিছু পিছু আসিয়া বেকুব হইয়া ফিরিতে কেহ রাজি নয়।

(৫)

বজরার মধ্যে শিবনারায়ণ ঘোষ, তাঁর স্ত্রী আর ছোট দু'টি ছেলে-মেয়ে। শিবনারায়ণের বড় দুঃসময়। জমাজমি ছিল, পাকাবাড়ি ছিল, বাড়িতে বারো-মাসে তের পার্বণ হইত। কিন্তু মানুষে নয়—নদীতে সর্বনাশ করিয়াছে; ঘরবাড়ি ভাঙিয়া লইয়াছে। আরও গিয়াছে—শক্ত সমর্থ যোল বছরের একটি ছেলে। সে অবশ্য নদীগর্ভে যায় নাই, ওলাওঠায় মারা গিয়াছে। নদীকূলে তার শেষকৃত্য চুকাইয়া শিবনারায়ণ দেশ ছাড়িয়াছেন, চিরদিনের জন্য ছাড়িয়াছেন। সঙ্গে কিছু টাকাকড়ি আছে। মতলব, সরকার ফতেহাবাদের মধ্যে প্রেমভাগ উঠতি জায়গা, পুণ্যস্থানও বটে—আচার্য রূপ ও সনাতন গোস্বামী বসবাস করিতেন—অতীত জীবনের সকল স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়া সেইখানে কুড়েঘর বাঁধিয়া সামান্য ভাবে থাকিবেন।

ছয় বৈঠার ডিঙা একেবারে পিছনে আসিয়া পড়িয়াছে। চিন্তামণি প্রশ্ন করে, কোথায় যাচ্ছ তোমরা মাঝি ?

বজরা-নৌকার মাঝি—ভারিক্কি চাল—জবাব দিল না। অকস্মাৎ গলা ছাড়িয়া গঙ্গা-বন্দনা গাহিতে শুরু করিল, বন্দ মাতা সুরধুনী, পুরাণে মহিমা শুনি, পতিতপাবনী পুরাতনী—

দুই নৌকা আগে পিছে রশিখানেক এমনি চলিল। তারপর ডিঙা হইতে করুণ আবেদন জানায়, ও মাঝি ভাই, আঁশ-বঁটি আছে তোমাদের সঙ্গে ? একটু-খানি যদি দাও—

বজরা তবু নিঃসাড়ে চলিতে লাগিল। ডিঙা হইতে আবার বলে, দাও ভাই বঁটিখানা। আশা করে এক পাতাড়ি মাছ কেনা গেছে, কোটার অভাবে তা পড়ে রয়েছে।

শিবনারায়ণের স্ত্রী সৌদামিনীর করুণা হইল। বলিলেন, দিয়ে দাও মাঝি। আহা, বলছে এত করে—

এস গো বাঁদিক পানে।

মাঝি বঁটিটা জলের দিকে উঁচু করিয়া ধরিল। দাঁড়-টানা বন্ধ রাখিয়াছে। নরহরির ডিঙা তীরের মতো বজরার গায়ে ভিড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সড়কি হাতে মরদেরা লাফাইয়া পড়িল বজরায়। রঘুনাথ ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিল, বঁটি দিয়ে লড়বি নাকি তোরা ? রেখে দে বঁটি। কি কি আছে, বের কর্ শিগগির।

জানে না কামরার মধ্যে আছেন শিবনারায়ণ, জানে না শিবনারায়ণের পাশে আছে পাকাবাঁশের পাঁচহাতি লাঠিখানা। তিনটা জেলায় যত ঢালি-ওস্তাদ আছে, এককালে ঐ লাঠির নামে তাদের বুকের ভিতর কাঁপিয়া যাইত। ইদানীং অবশ্য উহার ব্যবহার নাই। শিবনারায়ণ সর্বস্ব ফেলিয়া আসিয়াছেন, লাঠিও রাখিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু অজানা পথঘাটে নারী ও শিশু লইয়া একলা যাইতেছেন—সাত-পাঁচ ভাবিয়া শেষ পর্যন্ত লাঠি সঙ্গে আনিয়াছেন।

দীপের আলোয় শিবনারায়ণ নিবিষ্ট মনে পুঁথি পড়িতেছিলেন। পুঁথি পড়িয়া ভক্তিরসে মনটা নিষিক্ত করিয়া রাখিতে চান, কিন্তু ইহারা তাহা হইতে দিবে না। জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, ভারি যে বকবক করছ, কারা তোমরা? কি চাও?

চিন্তামণি সড়কি তাক করিল। সড়কি দেখিয়া শিবনারায়ণের মাথায় চনচন করিয়া রক্ত ঠেলিয়া উঠিল। হুঙ্কার দিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। লাঠির এক ঠোক্করে শিশুর হাতের খেলনার মতো সড়কি চিন্তামণির হাত ফসকাইয়া পড়িয়া গেল। নরহরি ঠিক এই সময়ে লাফাইয়া উঠিতেছিলেন বজরায়। লাঠি ঘুরাইয়া শিবনারায়ণ নরহরির কবজির উপর বাড়ি মারিলেন। সে কি বাড়ি—হাতখানাই শুধু নয়—সর্বদেহ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া যেন অসাড় হইয়া গেল। নরহরি জলে পড়িয়া গেলেন। এত সহজে পলাইতে দিবেন না, শিবনারায়ণের সঙ্কল্প—স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিঃসহায় নৌকায় রহিল, সে খেয়াল নাই—তিনিও ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন নরহরির সঙ্গে সঙ্গে। চিন্তামণি বজ্রাহতের মতো দাঁড়াইয়া। এমন করিয়া তাকে একেবারে পুতুল বানাইয়া দিল—এই আশ্চর্য লোকটির কাণ্ডকারখানা সে অবাক হইয়া দেখিতেছে।

আরও হইল। বছর দশেকের ফুটফুটে মেয়ে মালতী—এক-গা গহনা—সদ্য ঘুম ভাঙিয়া দুয়ারের ধারে চোখ মুছিতেছিল। এত কাণ্ড হইল, এতটুকু মেয়ে ভয় পায় নাই। সমস্তই ইহাদের তাজ্জব। গহনায় রঘুনাথের নজর পড়িয়াছে; মালতীকে সে ধরিবে। যেন লুকোচুরি খেলিতেছে, এমনি ভাবে এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল মেয়েটা। এক একবার ধরিয়া ফেলে আর কি! কিন্তু পারিয়া উঠে না, পাঁকালমাছের মতো পিছলাইয়া যায়। তারপর এক সময়ে ঝপ্‌পাস করিয়া জলে ঝাঁপ দিল। চিন্তামণি সহসা যেন সম্বিৎ পাইয়া হাহাকার করিয়া ওঠে। সে-ও ঝাঁপাইয়া পড়িল।

বেকুব রঘুনাথ ও দলের সকলে ডিঙায় ফিরিল। ডিঙা তখন সরিয়া অনেক দূরে

গিয়াছে। বজরার মাঝি হতবুদ্ধি হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে; জলস্রোতে সজোরে নৌকা পাক খাইল। ঝড়-জল কিছু নাই—এত বড় বজরা চালকের অভাবে জলতলে ডুবিয়া যায় আর কি!

সৌদামিনী বাহিরে আসিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে বলিলেন, না পার তো মাঝি সরে দাঁড়াও। আমি দেখছি। উজ্জ্বল গৌর গায়ের বর্ণ, কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা, উত্তেজনায় মাথার ঘোমটা খসিয়া পড়িয়াছে, মুখের উপর আগুন জ্বলিতেছে যেন। সাত বছরের কীর্তিনারায়ণ সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া মাকে জাপটাইয়া ধরিল। সেই হইয়াছে বিষম বাধা—নহিলে তিনি কখন এমন চুপচাপ থাকিতেন না।

মাঝি যেন চমক ভাঙিয়া ওঠে। বলিল, না মা, সে কি কথা!

দৃঢ় হাতে আবার সে হাল বাহিতে লাগিল।

সৌদামিনী আদেশ দিলেন, ঐ আমার মেয়ে ভাসছে, কর্তার কাছে পৌঁছতে পারছে না। নৌকো ঘুরিয়ে নাও ঐদিকে।

দুরুম, দুরুম!

বন্দুকের আওয়াজ। খালের মধ্য হইতে নীলরঙের বোট তীরের মতো বাহির হইয়া আসিল। মেঘ কাটিয়া পরিষ্কার জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। দিগ্‌ব্যাপ্ত নদীজল জ্যোৎস্নার আলোয় ঝিকমিক করিতেছে। বন্দুকের শব্দে ওপারের অশ্বত্থতলা হইতে উল্টা দিকে উজান ঠেলিয়া আরও খান দুই পুলিশের বোট আসিতে দেখা গেল। জল-পুলিস এখানে আসিয়াও আস্তানা পাতিয়াছে!

শিবনারায়ণ ও নরহরি খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছেন। নরহরি বলিলেন, উঃ—জোর বটে তোমার লাঠির! ডান হাতের দফা শেষ করে দিয়েছ, এবার মাথাটার উপর লোভ বুঝি! এমন লাঠি ধরতে জান তো পুলিশের লেজুড় ধরে বেড়াচ্ছ কি জন্য? মরদের মতো মাথায় লাঠি মারো, ক্ষোভ থাকবে না। কিন্তু দোহাই ভাই, পুলিশের হাতকড়ি পরিও না।

শিবনারায়ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমি বোষ্টম মানুষ, শাক-পাতা খাই—মাথার উপর লোভ নেই আমার। হাতখানা চুরি-ডাকাতির কাজে লাগিয়েছ কেন? নইলে ওটার পরেও কোন আক্রোশ হত না।

সাঁতার দিয়া নীল-বোটের কাছে গিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, আমার মেয়ে নৌকো থেকে জলে পড়ে গেছে—তারই হৈ-চৈ। আর কিছু নয়।

নরহরিকে দেখাইয়া বলিলেন, অতি মহাশয় ব্যক্তি। আমার বিপদ দেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এঁরা সব।

মেয়ে জলে পড়িয়াছে, শিবনারায়ণ ঘাড় ফিরাইয়া তখনই দেখিয়াছেন। তা বলিয়া তাঁর মনে কোন উদ্বেগ নাই। ভাঁটি-অঞ্চলের মানুষ—ইঁহাদের কাছে ডাঙায় হাঁটিয়া বেড়ানো যা জলে সাঁতার কাটা তার চেয়ে কষ্টকর কিছু নয়। জ্যোৎস্নার স্বচ্ছ আলোয় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, মালতী ভাসিতে ভাসিতে অনেকটা দূর গিয়াছে, চিন্তামণি পারিয়া উঠিতেছে না—পিছনে পড়িয়াছে। ডাকিতেছে, ভয় নেই মা—পালিও না, ধরতে দাও। কিন্তু উল্টা-পাল্টা হাওয়ায় আহ্বান মালতীর কানে পৌছিতেছে না বোধ হয়। ভয় পাইবার মানুষই বটে এই মেয়ে! ঘুরিয়া একবার বা কাছাকাছি আসে, চিন্তামণি ধরিবার জন্য দ্রুত বাহুবিক্ষেপে জল কাটাইয়া তীরবেগে নিকটে গিয়া পড়ে। পানকৌড়ির মতো মালতী ভুস-ভুস করিয়া ডুব দেয়। চিন্তামণিও সেইখানটায় আসিয়া ডুব দিল—অর্থাৎ তাহাকে নির্ঘাৎ ধরিয়া ফেলিবে এবার। কিন্তু কোথায় সেই চঞ্চলা মেয়ে—ডুব-সাঁতার দিয়া একেবারে হাত কুড়িক গিয়া সে ভাসিয়া উঠিয়াছে। এ তো আততায়ীর হাত হইতে নিস্তার পাইবার প্রয়াস নয়—ঠকাইয়া বেকুব বানাইয়া দিতেছে দুর্ধর্ষ এক জোলো-ডাকাতকে।

জল-পুলিশের বোট বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হইল। তরঙ্গ-মুখর মালঞ্চের উপর জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিবেলা বজরায় উঠিয়া ভিজা কাপড়ে নরহরি ও শিবনারায়ণ কোলাকুলি করিলেন। ডিঙা বেগতিক বুঝিয়া প্রাণপণে বৈঠা

বাহিয়া সরিয়া পড়িতেছিল, নরহরি জকার দিতে বজরার পাশে আসিয়া ভিড়িল। নদীজল হইতে উঠিয়া মালতী বাপের গা ঘেঁসিয়া বসিল। নরহরি বলিলেন, তোমায় ছাড়ব না ভাই, শ্যামগঞ্জে নিয়ে যাব। যেতেই হবে।

শিবনারায়ণ জবাব না দিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

লাঠিতে হেরে গেছি—কিন্তু বুকে নিয়েছ, সেই জোরে তোমাদের টেনে নিয়ে যাব। ঝেড়ে ফেলে দেবে তো বুকে জড়িয়ে ধরলে কেন ভাই?

শিবনারায়ণ বলিলেন, নাগালের মধ্যে এসে পড়লে যে!

সবাইকে বুকে নাও এই রকম?

চেষ্টা করি অন্তত। ধরে নিয়ে শ্যামঠাকুরের দরবারে হাজির করে দিতে চাই। ঠাকুর অন্তরের কালিমা মুছে দেন।

নরহরি মুখ ফিরাইলেন। মুখ তাঁর কালো হইয়া গিয়াছে।

বুড়া চিন্তামণি ওদিকে শিবনারায়ণের পায়ের গোড়ায় বসিয়া বলিতেছে, লাঠি-সড়কি কিচ্ছু জানি নে আমি, একেবারে কিছু না। আজকেঁ টের পেলাম।

শিবনারায়ণ বলিলেন, যা জান, ব্রতভ্রষ্ট হয়ে তা-ও কাজে আসছে না। লাঠির অপমান কর তোমরা—তোমাদের এই বৃত্তি অধর্ম খেলোয়াড়ের পক্ষে।

চিন্তামণি কাতর হইয়া বলে, গুরু বলে প্রণাম করলাম, দু-একখানা চাল আর দুটো-একটা বড়ি অন্তত আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে।

আজকাল ভুলে গেছি ও-সব।

চিন্তামণি বলিতে লাগিল, আপনার দরকার না-ই যদি থাকে, মানুষ কি লাঠিবাজি ছেড়ে দেবে একেবারে? আর দশজনের তো কাজে লাগবে। পাদপদ্মে আশ্রয় নিয়েছি, লাথি মারলেও নড়ব না।

(৬)

শিবনারায়ণকে থাকিয়া যাইতে হইল। ইহারা নাছোড়বান্দা। নরহরি

মনে করেন, কালী কপালিনী করুণা করিয়া মালঞ্চের প্রবাহে তাঁর এক ভাই বহিয়া আনিয়া দিয়াছেন। এ বিরাট প্রাসাদে স্বচ্ছন্দে দু-ভায়ের স্থান কুলাইয়া যাইবে। শ্যামশরণের আমলের বিষয়-সম্পত্তি তেমন কিছু নাই—কিন্তু নূতন সম্পত্তি করিতে কতক্ষণ? নরহরির ইতিমধ্যেই কিছু সঞ্চয় হইয়াছে, শিবনারায়ণও রিক্ত হস্তে আসেন নাই।

লাভজনক ধানের কারবারটা কিন্তু ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। শিবনারায়ণ নদী-খালে কিছুতে এইরকম ভাবে ঘুরিতে দিবেন না। তিনি লাঠিয়াল—লাঠিয়ালের রীতি ইহা হয়, ইহা হীনকর্ম। তা ছাড়া দিনকাল বদলাইয়াছে। শ্যামশরণ যে ভাবে চলিতেন, তাহা এযুগে অচল।

কারবার ছাড়িয়া অবধি নরহরির ঘরের বাহির হইবার বড় একটা গরজ হয় না। তাঁকে গানের নেশায় পাইয়া বসিতেছে। ঢালিপাড়ার তাঁরই উৎসাহে নূতন এক ভাব-গানের দল হইল। দলের খুব নাম পড়িয়া গিয়াছে। যেদিন গ্রামের মধ্যে গান হয়, দেখিতে পাওয়া যায়, নরহরি শ্রোতাদের সামনে নিবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। স্থির দৃষ্টি—অচঞ্চল। শমের মুখে কেবল এক-একবার দুই জানুতে দুটি হাতের মৃদু আঘাত পড়ে, ফাঁকা উঠানের কম্পমান আলোয় আঙুলের আংটির হীরা মুহূর্তের জন্য ঠিকরাইয়া উঠে। গান ভুলিয়া গায়কদেরও এক মুহূর্ত নজর পড়িয়া যায় তাঁর দিকে। গান ছাড়া আর কোন ব্যাপারে ইদানীং নরহরিকে সন্ধ্যার পর বাহিরে দেখা যায় না।

একে একে পাঁচখানা চক কেনা হইয়াছে ইতিমধ্যে। শিবনারায়ণের সমস্ত সকালবেলাটা কাটিয়া যায় বিষয়-আশয়ের তদারক করিতে, ঠাকুরের নাম লইবার অবসর ঘটে না। এজন্য তিনি বিচলিত হইয়া উঠিতেছেন। মুক্তির আশায় বাহির হইয়া এ কোথায় আটকাইয়া গেলেন? দিন দিন পঙ্কে তলাইয়া যাইতেছেন। অনেকবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, নিজেকে এ-সবের মধ্যে আর জড়াইবেন না। কিন্তু নরহরির উপর যে এক বিন্দু আস্থা করিবার উপায় নাই। শক্তি আছে, বুদ্ধিও

আছে—কিন্তু তাঁর হাতে কিছু ছাড়িয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি অঘটন ঘটাইয়া বসিবেন। অন্তত শিবনারায়ণ যতটা বুঝিয়াছেন, তাহাতে তাঁর এইরূপ আশঙ্কা।

কীর্তিনারায়ণ একদিন নরহরিকে ধরিয়া বসিল, সে-ও গান শুনিতে যাইবে তাঁর সঙ্গে। আবদার কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়, গানে বনের পশু বশ হইয়া যায়। নরহরি আপত্তির কিছু দেখিলেন না, বরঞ্চ মনে মনে খুশি হইলেন। এ বিষয়ে কীর্তিনারায়ণের সত্যই যদি অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, বাড়ির মধ্যেই তাঁর একজন জুড়ি পাওয়া যাইবে। বেলা পড়িয়া আসিতে চুপি-চুপি দু-জনে বাহির হইলেন।

সেদিন আবার বিশেষ একটু ব্যাপার। অনেক দূর—পূব অঞ্চল হইতে আর একটা দল আসিয়াছে, দুই দলে গানের পাল্লা হইবে। লোক গিস-গিস করিতেছে, অত বড় মাঠটি নরমুণ্ডে ভরিয়া গিয়াছে। দু-পাশ দিয়া সারবন্দি কলার তেউড় বসানো, তার উপর তুষ-ভরতি সরা। ঘোর হইয়া আসিতে তুষে কেরোসিন ঢালিয়া জ্বালাইয়া দিল। চারিদিকে আলো-আলোময় হইয়া গেল।

গুড়-গুড় করিয়া ঢোল বাজিয়া উঠিল। গান খুব জমিয়া গেল। চারিদিকে 'বাহবা' 'বাহবা' রব উঠিতেছে। অষ্টমীর চাঁদ ডুবিয়া গেল, গানের তবু বিরাম নাই।

আসর ভাঙিয়া গেলে বাড়ি ফিরিবার সময় কীর্তিনারায়ণের গা কাঁপিতে লাগিল। এত রাত্রি অবধি কখন সে বাড়ির বাহিরে থাকে নাই। পাঠশালা ফাঁকি দিয়া ইতিপূর্বে কখন কখন সমস্তটা দিন পলাইয়া বেড়াইয়াছে, শিবনারায়ণ তাহা লইয়া রাগও করিয়াছেন, পরে আবার সব জুড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু রাত্রির অনুপস্থিতির এই ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াইবে, কে জানে?

নরহরিরও ভয় হইল। শিবনারায়ণ যদি চেঁচামেচি করিয়া হাতে মারিয়া শাস্তি দিতেন, আপদ চুকিত, যা হোক এক রকম আস্কারা হইয়া যাইত। কিন্তু থমথমে মুখে ক'দিন তিনি ঘুরিয়া বেড়াইলেন, ভালমন্দ একটি

কথা কহিলেন না কীর্তিনারায়ণের বিষয়ে যেন নির্লিপ্ত হইয়া যাইতেছেন, এই রকম ভাব।

নরহরি আর চিন্তামণি কীর্তিনারায়ণের হাত টিপিয়া একদিন খুব তারিপ করিতেছিলেন। শেষে নরহরি শিবনারায়ণকেও না ডাকিয়া পারিলেন না।

দেখে যাও ভাই, চেয়ে দেখেছ কোন দিন? যা কবজির গড়ন, এ ছেলে সবাইকে আমাদের ছাড়িয়ে যাবে, এই বলে দিলাম।

প্রশংসায় কীর্তিনারায়ণের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল, বাপ সামনে আসিতে ছাইয়ের মতো সাদা হইয়া গেল। শিবনারায়ণ তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

না ভাই, বোষ্টম মানুষ—আমার ছেলেকে লাঠিবাজির মধ্যে নিও না আর তোমরা।

নরহরি বিদ্রূপ-কণ্ঠে বলিলেন, বয়স হয়ে তোমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে। বাঘের বাচ্চা বাঘ হবেই। খাঁচায় পুরে যতই নিরামিষ চাল-কলা খাওয়াও, নখ-দাঁতে দেখতে পাবে আপনাআপনি ধার হয়েছে। ঠেকাতে পারবে না।

শিবনারায়ণ বেশি তর্ক করেন না। তাঁর মনের বাসনা, কীর্তিনারায়ণ নরহরির ছেলে শ্যামকান্তর মতো শান্ত-সভ্য হইয়া উঠুক। যে দিন-কাল আসিতেছে, তাহাতে টিকিয়া থাকিবে শ্যামকান্তরাই। এক একবার এমনও মনে হয়, ছেলে লইয়া ইহাদের মধ্য হইতে পলাইয়া যাওয়া উচিত। তবে আনন্দের ব্যাপারও আছে, বাঁধন ধীরে ধীরে শ্লথ হইয়া যাইতেছে। ছেলে বাপের চেয়ে নরহরিরই বেশি অনুগত। লীলাময় প্রভু কাঁধের বোঝা নামাইয়া দিতেছেন, তাঁর দায়িত্ব অন্য লোকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতেছে। ইহাতে আরাম পাইবার তো কথা!

খালের ওপারে বরণডাঙা গ্রামের সঙ্গে হুনদাড়ি খেলায় কীর্তিনারায়ণের

একদিন পাল্লা হইয়া গেল। শ্যামগঞ্জের জিত হইল। খেলা ভাঙিতে সন্ধ্যা গড়াইয়া গেল। তা যাক, ফূর্তিতে সকলে তুড়িলাফ দিতে দিতে ফিরিয়া আসিতেছে। এমন সময় দীঘির পাড়ের খেজুরবনে ঠন-ঠন করিয়া ভাঁড়ের আওয়াজ শোনা গেল। বেশ ঘোর হইয়া আসিয়াছে, গাছেরও মাথা অবধি ভাল নজর চলে না।

একজন বলিল, শোড়েল উঠে রস খাচ্ছে।

উঁহু। দলপতি কীর্তিনারায়ণ নজর করিয়া দেখিয়া ঘাড় নাড়ে। ঐ যে ছায়া—শোড়েল ঐ রকম লম্বা হয় বুঝি! চল তো এগিয়ে—ওদিকে দীঘি, তিনদিক ঘিরে সামাল হয়ে যাই চল—

আবার অতি সন্তর্পণে দেখিয়া লয় একবার।

মানুষ—আক্রমণ করতে হবে। খালি হাতে নয়—জিওলের ডাল ভেঙে নাও এক-একখানা।

তাহাই হইল। হাতের মাথায় যে যেমন পাইল, এক এক ডাল ভাঙিয়া আগাইয়া চলিল। হঠাৎ—ও বাবা রে! উপর হইতে ছড়ছড় করিয়া খেজুর-রস পড়িল একজনের মাথায়, মাথা হইতে গড়াইয়া সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল। শীতের রাত্রি, উত্তুরে হাওয়া দিতেছে, মুহূর্তে তার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া কুঁকড়াইয়া উঠিল। তার পরে যে অবস্থা হইবে, ভাবিতে ভয় হইয়া যায়—চুল এমন আঠা হইয়া মাথার সঙ্গে আঁটিয়া যাইবে, গা চটচট করিবে, যে এই রাতে রীতিমতো অবগাহন স্নান না করিয়া পরিত্রাণ নাই।

কীর্তিনারায়ণ রাগিয়া মুখ খিঁচাইয়া ওঠে। সরে আয়, দূরে আয়—শত্রু-ব্যূহে যেতে আছে ঐ রকম অসাবধান হয়ে? ভাগ্যি ভালো, ভাঁড়ের রস ফেলেছে—আস্ত একটা ভাঁড় মাথায় ভাঙে নি।

গলা উঁচু করিয়া অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশে সে কহিল, মেঘের আবরণে বরুণ-বাণ মারছ কেন ইন্দ্রজিৎ? ভূমে এসে রণ দাও। পরীক্ষা হোক, কার কেমন শক্তি।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। অন্ধকার, শত্রুদল কি করিতেছে ঠাহর করা যায় না। চষাক্ষেত হইতে মাটির ঢিল কুড়াইয়া ইহারা প্রস্তুত হইয়া আছে। সামনে হঠাৎ কয়েকটা ছায়ামূর্তি। কীর্তিনারায়ণ রুখিয়া উঠিল, আক্রমণ কর—ধ্বংস কর—

শত্রুদলের একজন আগাইয়া একেবারে ইহাদের মধ্যে চলিয়া আসিল। বলে, রস খাচ্ছিলাম এক ঢোক—

কীর্তিনারায়ণ তাহাকে চিনিল। নাম ভানুচাঁদ—পরে জানিয়াছে। নরহরির সহিত সেই যে গান শুনিতে গিয়াছিল, সেই আসরে উহাকে সে দেখিয়াছিল।

ভানুচাঁদ বলে, রস খাচ্ছি তা তোমরা ওরকম লেগেছ কেন বল দিকি?

কীর্তিনারায়ণ মুরুব্বিয়ানা করিয়া জবাব দেয়, খাবে তা চেয়ে খাওয়াই তো উচিত। না বলে নিলে চুরি করা হয় না?

ভানুচাঁদ বলে, চাইলে কি দেয়? উল্‌টে গালিগালাজ করে।

ইহার উপরে যুক্তি নাই। চাহিলে দেয় না, অতএব না চাহিয়াই ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে—আর কি তৃতীয় পন্থা থাকিতে পারে? কীর্তিনারায়ণ তর্ক না তুলিয়া বলিল, তা হলে মোটের উপর বক্তব্যটা কি দাঁড়াচ্ছে? সন্ধি?

অত সব সাধু-উক্তি বুঝিবার ক্ষমতা ভানুচাঁদের নাই, মুরারি পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়ে নাই তো! সে কেবল ঘাড় নাড়িল। কীর্তিনারায়ণ খুশি হইয়া বলে, বেশ—মঞ্জুর। ক-জন তোমরা? গাছ ক'টা সব কি সাবাড় হয়ে গেছে?

না, তাহারা জন চারেক মাত্র। সবে শুরু করিয়াছিল—বহুত গাছ বাকি এখনো। নিচু গাছগুলির রস খাওয়া যাইবে না, শিয়ালের উৎপাতে গাছিরা নেড়া-সেঁজির আঠা দিয়া রাখে। তা লম্বা গাছ গণিয়া দেখিলে পনের-কুড়িটা হইবে বই কি!

মজা-দীঘির জলে পাট পচানো। কতক পাট কাচিয়া লইয়া গিয়াছে, পাটকাঠি স্তূপাকার হইয়া আছে। তাহারই এক এক টুকরা ভাঙিয়া লইয়া কাঠবিড়ালির মতো সকলে এগাছ-ওগাছ করিতে লাগিল।

বড় কড়া মুরারি পণ্ডিত, তিলমাত্র ফাঁকি চলে না। এক পাশে জল-চৌকির উপর তাঁর আসন, পাশে জোড়া-বেত। সামান্য যদি গুঞ্জন ওঠে পাঠশালার কোন কোণে, বেতটা কেবল ছুঁইলেই হইল, তার অধিক আবশ্যক নাই। তবে কীর্তিনারায়ণের সঙ্গে সম্পর্ক আলাদা। কি কারণে সঠিক বলা যায় না, তাকে শাসন করিতে পণ্ডিতের সাহসে কুলায় না। বড় রাগ হইলে তার যে কিছু হইবে না—ঠারে-ঠোরে এইটুকু মাত্র জানাইয়া দেন।

খুঁটির গায়ে পেরেক পোঁতা। তাহাতে এক টুকরা কাঠ টাঙানো থাকে, কাঠে খুদিয়া লেখা আছে—'বাহির'। বাহিরে যাইবার গরজ হইলে পণ্ডিতের কাছে ছুটি লইবার প্রয়োজন নাই, কাঠখানা হাতে লইয়া চলিয়া যাও। দুই রকম সুবিধা এই ব্যবস্থায়—পণ্ডিতকে বারম্বার কথা বলিয়া হুকুম দিতে হয় না, তা ছাড়া কাঠ একখানা মাত্র থাকার দরুন একসময়ে একজনের বেশি বাহিরে থাকিতে পারে না। আবার থুতু ফেলিয়া যাইবার নিয়ম। অতি দ্রুত কাজ সারিয়া থুতু শুকাইবার আগেই ফিরিতে হইবে। ছেলেরা ইটের উপর কিম্বা ঘাসবন দেখিয়া থুতু ফেলে, যাহাতে অতিশীঘ্র থুতু না শুকায়। ছুটি এইরূপে যতটা দীর্ঘস্থায়ী করিতে পারা যায়।

বইয়ের পড়া হয় বিকালবেলা। সেটা নিতান্তই গৌণ—সব দিন যে হইবে তার ঠিক নাই। হাটবারে পণ্ডিত হাট করিতে যান, সেদিন বিকালে পাঠশালা বসেই না। তা ছাড়া দলিল লিখাইতে সামাজিক বা অন্য কোন গোলমাল বাধিলে সালিশি করিতে মাঝে মাঝে পণ্ডিতের ডাক পড়ে। বিকালে পাঠশালার তাই নিশ্চয়তা নাই।

আসল কাজকর্ম সকালবেলার দিকে। প্রথমে হাতের লেখা—তাল-পাতায়, কলাপাতায়, শ্লেটে। কসবায় নূতন শ্লেট উঠিয়াছে, অবস্থাপন্ন দু-চারিজন

কিনিয়া আনিয়াছে ছেলেদের জন্য। হাতের লেখার পর কোনদিন হয় শ্রুত-লিখন, কোনদিন বা পত্র ও দলিলের রকমারি মুশাবিদা। ঘরের ভিতরের ছেলেরা শুভঙ্করী ও পাটিগণিতের আঁক কষে, বাহিরের বারাণ্ডায় সেই সময় ছোট ছেলেরা ধারাপাত অভ্যাস করে।

পণ্ডিত বলিলেন, নামতা পড়া দেখি আজ ফটকে। কুড়ির ঘর অবধি।

শুকনা মুখে ফটিক উঠিল। আট ছয়ে কত হয়, বলিতে পারে না—সেই পড়াইবে কুড়ির ঘর! সন্ত্রস্ত ভাবে গিয়া সে দাঁড়াইল। চুপচাপ দাঁড়াইয়া আছে।

হল কি?

শেয়ালে কাল আমাদের হাঁস ধরে নিয়ে গেল পণ্ডিত মশায়—

তোমার মুখের বাক্যিও কি নিয়ে গেছে?

শেয়াল তাড়িয়ে বেড়িয়েছি, পড়তে পারি নি।

শ্যামকান্ত বাহিরে আসিয়া বলে, আমি পড়াই পণ্ডিত মশায়।

শ্যামকান্ত সর্দার-পড়ুয়া নয়—তারও উপরে। কসবায় গিয়া বৃত্তি-পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছে। যতদিন ফল না বাহির হইতেছে, পাঠশালায় যাতায়াত করে, মাতব্বরি করে এই মাত্র।

মুরারি পণ্ডিত তটস্থ হইয়া বলিলেন, পড়াবে তুমি—ইচ্ছে হয়েছে? তা বেশ, পড়াও—

কীর্তিনারায়ণের দিকে এক নজর চাহিয়া তখনই আবার মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, পরীক্ষায় তুমি প্রথম হবে। আমি নিশ্চয় জানি। মুখ উজ্জ্বল করবে তুমি চৌধুরি-বাড়ির।

নামতা পড়ানো শেষ হইল। তারপর শ্যামকান্ত বলে, কড়া-বুড়ি-পণ-কাঠা-সের—এ সব তো হয় নি ক-দিন। পড়াব?

বারাণ্ডার নিচে নারিকেল-গুঁড়ি কাটিয়া ধাপ বসানো। কীর্তিনারায়ণ সে দিকে চাহিয়া আছে। তৃতীয় পৈঠায় ছায়া আসিলেই ছুটি হইয়া যায়, এখন ছায়া

তারও নিচে—চতুর্থ পৈঠা অবধি নামিয়াছে। কাঠা-সের এখনো শুরুই হয় নাই। এই ভাল ছেলেগুলার জ্বালায় পড়িতে আসিয়া সুখ নাই একটু।

মাঝে মাঝে ঢাকের আওয়াজ আসিতেছে। বড় যখন বাজিয়া ওঠে, পণ্ডিত উন্মনা হন। দীননাথ হাজরাতলায় মানত-পূজা শোধ করিতে গিয়াছে। তার ছেলে কেশবের অসুখ করিয়াছিল, বিকারে দাঁড়াইয়াছিল। সারিয়াছে, তাই এ-পূজা।

কীর্তিনারায়ণকে পণ্ডিত বলিলেন, শুনছ? কি রকমটা মনে হয়?

কীর্তিনারায়ণ প্রণিধান করিয়া বলে, উঁহু, বলির বাজনা আলাদা—

পণ্ডিত ঘাড় নাড়িয়া বলেন, তা বলে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না বাপু। বলি না বাজিয়ে যদি কেবল আরতিই বাজিয়ে যায়। বড় বজ্জাত—ও বেটা সব পারে। জানে, বাজনা শুনলেই হকদারেরা এসে পড়বে।

আবার বলেন, তুমি গিয়ে বরঞ্চ হাজির থাক ঐ জায়গায়; নইলে সরিয়ে ফেলবে। গিয়ে বলোগে, কেশব যখন এই পাঠশালার ছেলে তিনটে পাঁঠার মধ্যে অন্তত একটার মুণ্ডু আমি পাব।

কীর্তিনারায়ণ রক্ষা পাইয়া গেল। আর তিলার্ধ সে দেরি করিল না। এক সহপাঠীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলে, আয় রে তিনু, দু-জনে যাই—

না, তোমার যাওয়া হতে পারে না কীর্তি, হাজরাতলা বউভাসির চকের ভিতর—ভিন্ন এলাকায়।

পণ্ডিত শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাইলেন। দৃঢ়স্বরে শ্যামকান্ত বলিতে লাগিল, বাইরের এলাকায় তুমি হাত পেতে গিয়ে দাঁড়াবে, চৌধুরিদের তাতে অপমান হয়। যেও না।

ছোট মুখে বয়স্কদের মতো পাকা কথা শুনিয়া কীর্তিনারায়ণ সকৌতুকে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সবটুকু শুনিয়া তিনুর হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে যেমন যাইতেছিল, তেমনি বাহির হইয়া গেল। ভালোমন্দ একটা জবাব পর্যন্ত দিল না। অন্তত এই একটা ব্যাপারে একঘর ছেলেপুলে

ও পণ্ডিতের সামনে শ্যামকান্তকে অগ্রাহ্য করিতে পারিয়া ভারি সে তৃপ্তি বোধ করিল।

বয়সে ছোট হইলে কি হয়—শ্যামকান্ত সকল খবর রাখে। বউভাসির চক লইয়া কর্তাদের ভিতর খুব মন-কষাকষি চলিতেছে। মালিক বরিশাল জেলার লোক—কি রকমের কুটুম্বিতাও আছে চৌধুরিদের সঙ্গে। জমি অত্যন্ত উর্বর—বাঁধ দিয়া নোনা ঠেকাইতে পারিলে একেবারে সোনা ঢালিয়া যায়। কিন্তু তার চেয়েও বড় প্রলোভন—চকটা ঢালিপাড়ার ঠিক উত্তর প্রান্তে; ওটা পাওয়া গেলে বাহিরের কাহারও এ অঞ্চলে আসিয়া মাথা গলাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

অতদূর বরিশাল হইতে জমিদার কালে-ভদ্রে আসেন, নায়েব-গোমস্তা কাজ চালাইয়া যায়। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল, না আসিয়াও শ্যামগঞ্জ তরফের গরজটা তাঁরা ঠিক বুঝিয়া ফেলিয়াছেন। প্রথম মাস কয়েক চিঠিপত্রে উভয় পক্ষ হইতে পরস্পরের মহিমা-কীর্তন চলিয়া অবশেষে যখন টাকার অঙ্ক প্রকট হইল, নরহরি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

শিবনারায়ণ প্রবোধ দিলেন, থাকগে—কি হবে আর জমি-জমায়? পাঁচ পাঁচখানা চক আমাদের—কম নয় তো! বেশি লোভ না করাই ভাল। সম্পত্তি বাড়ানো একটা বিষম নেশা, ভাই। নেশার ঘোরে চলেছি আমরা।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিলেন, দেখ, সব মানুষই বেঁচে থাকতে চায়—সবারই বাঁচবার অধিকার রয়েছে। একের লোভ বিশ্বগ্রাসী হলে আর দশজনেরই সর্বনাশ হয় তাতে। আমার তো মনে হয়, পৃথিবীতে জায়গা-জমি যা আছে তাতে কারও অনটন হবার কথা নয়। কিন্তু মানুষের লোভ বেড়ে চলেছে—লোভের জায়গা হচ্ছে না বলেই চারিদিকে এত অশান্তি।

নরহরির এত সব শুনিবার ধৈর্য নাই। তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন। বলিলেন, তাই দেখ, লোভ ওদের কি রকম সীমা ছাড়িয়ে গেছে! এমন খাপছাড়া

দর হাঁকবে কি জন্য? বিক্রি করবে না, স্পষ্ট বলে দিলেই পারত। চক্ষু-পর্দা আছে নাকি ওদের? আবার লিখেছে—কুটুম্ব, আপনার লোক! হাত নিশপিশ করছে—নাগালের মধ্যে পেলে কুটুম্ব আর কুটুম্বর চক নোনাজলে একসঙ্গে নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছাড়তাম।

তা নরহরি অনায়াসে পারেন, শিবনারায়ণের ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। জানেন, লাভ নাই—তবু বুঝাইতে লাগিলেন, লোভ হল আগুনের শিখা। লোভের বস্তু যত সংগ্রহ হবে, আগুনে ঘৃতাহুতির মতো লোভ ততই প্রখর হয়ে উঠবে। চকের পর চকের মালিক হয়ে তোমার লোভ বেড়েই যাচ্ছে। তাঁরা এর সুযোগ নিতে ছাড়বেন কেন? তোমার লোভে তাঁদেরও লোভ উদ্দীপ্ত হয়েছে—আগুনের সংযোগে ইন্ধন জ্বলে উঠবার মতন। এই লোভের হানাহানিতেই মানুষের সমাজে এত গণ্ডগোল।

নরহরি তখনকার মতো চলিয়া গেলেন। কিন্তু মনে মনে রাগ পুষিয়া রাখিলেন, শিবনারায়ণের বুঝিতে বাকি রহিল না।

(৮)

একদিন ভানুচাঁদ খবর দিল, আজকে যাত্রা আছে। অঘোর অধিকারীর দল। নূতন পালা, মাথুর—

কীর্তিনারায়ণ লাফাইয়া উঠে, কোথায় রে? কদ্দূর?

বরণডাঙায়—মাধব দাস বাবাজির আখড়ায়। দূর আর কি, খাল পার হয়ে পোয়াটাক যদি হয় বড় জোর। ওরা পারাপারের নৌকোর ব্যবস্থা করেছে, অসুবিধা কিছু নেই।

প্রলুব্ধ স্বরে কীর্তিনারায়ণ বলে, আমি যাব—নিয়ে যাবি?

কিন্তু উপায় কি বিশাল প্রাসাদ হইতে অত রাত্রে বাহির হইয়া যাইবার?

যাইতেই হইবে, মাথুর পালা সে শুনিবেই। নাককাটির খালে জোয়ার

লাগিবে দেড় প্রহর রাত্রে। জেলেরা ভেসাল জাল তুলিয়া বাড়ি ফিরিবে। জেলেদের কথাবার্তা, বৈঠা বাহিবার সময় ডিঙির গায়ে আওয়াজ—এই সব হইবে সঙ্কেত। সেই সময় কীর্তিনারায়ণ খিড়কির দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিবে। দরজা খোলা থাকিবে, তা আর করা যাইবে কি? বরঞ্চ ফিরিবার সময় ইহাতে সুবিধাই হইবে।

ভাত খাইয়া কীর্তিনারায়ণ যথারীতি শুইতে গেল। এক বড় খাটে তার আর শ্যামকান্তর বিছানা। একটু পরেই শ্যামকান্ত ঘুমাইয়া পড়িল। কীর্তি-নারায়ণ উস-খুস করিতেছে। সৌদামিনী শুইবার পূর্বে আবার মশারি গুঁজিয়া দিয়া যান। ভাবিয়া ভাবিয়া সে এক বুদ্ধি বাহির করিল; পাশবালিশটা শিয়রের বালিশের উপর শোয়াইয়া আগাগোড়া কাঁথা দিয়া ঢাকা দিল—যেন কীর্তি-নারায়ণই মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে। জোয়ার আসিল কিনা, ঘরের ভিতর হইতে বুঝিবার উপায় নাই। এদিক-ওদিক চাহিয়া সুড়ুৎ করিয়া এক সময় সে বাহির হইয়া গেল। পাঁচিলের ধারে গাবতলায় ক্ষণকাল উৎকর্ণ হইয়া সে জোয়ারের সাড়াশব্দ লইতে লাগিল। আবার বাড়ির দিকেও তাকাইয়া দেখিতেছে, কেউ তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে কিনা।

ভানুচাঁদ ঠিক সময়ে আসিল।

অন্ধকার রাত। কিন্তু বাঁধের শুকনা রাস্তা—চলিতে কষ্ট হইতেছে না। তামাক সাজিয়া লইয়াছে, দু-জনে পালা করিয়া টানিতেছে। এক ছিলিম শেষ হইয়া গেলে পথের ধারে বসিয়া আবার সাজিয়া লয়। খোলা মাঠের হাওয়ায় মনের আনন্দে অবাধ স্বাধীনতায় তামাকের ধোঁয়া ছাড়িতেছে। কাহাকেও সমীহ করিবার আবশ্যক নাই এখন। চিতলামারির খাল পার হইয়াও পথ ক্রোশ খানেকের কম হইবে না, কিন্তু নব-আস্বাদিত আনন্দে তারা যেন উড়িয়া চলিল।

কি তাজ্জব যে গাহিল অঘোরের দল! জুড়ির গানের ধরতা দেয় অঘোর

নিজে। গেরুয়া রঙের আপাদ-লম্বিত একটা জামা পরিয়া সে আসরে নামে। আটখানা মেডেল পাইয়াছে; গলায় ঝুলানো সেই মেডেলের মালা লণ্ঠনের আলোয় ঝিকমিক করে। বুড়ো হইয়াছে, কিন্তু গলা কি মিঠা! মেডেল লোকে তাহাকে অমনি দেয় নাই।

পালা ভাঙিতে সকাল হইয়া যাইবে, আগেই তারা ফিরিল। খিড়কির দরজা খোলাই আছে, কীর্তিনারায়ণ টিপিটিপি উপরে উঠিয়া আসিল। হাত-পা ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে, ধরা পড়িলে রক্ষা নাই। নিঃশব্দে সে শুইয়া পড়িল।

দু-এক বাড়ি গাহিবার পর অঘোরের দলের নাম পড়িয়া গেল। মূল-পালা শেষ হইবার পর প্রহসন হয় দু-একখানা। অঘোরের সে সময়টা আসরে কাজ নাই, সাজঘরে আসিয়া সাজ-পোযাক ও চুল-দাড়ি গণিয়া মিলাইয়া বাক্সবন্দি করে। প্রায়ই ডাক আসে সেই সময়।

শুনবেন একটু, অধিকারী মশায়। শনিবারের দিনটা আমাদের ওখানে। বায়না নিয়ে নেন, কাল থেকে নেমন্তন্নে লোক বেরুবে।

অঘোর বলে, শনিবারের দিন মালাধর গোমস্তা মশায়ের বাড়ি। শনিবার নয় আজ্ঞে। রবিবারেও না—সোমবার। পহর খানেকের মধ্যে পৌছব গিয়ে। রান্নাবান্না ওখানে—আটত্রিশ জন লোক আমার দলে।

হাসিয়া বলে, পোনামাছ খাওয়াতে হবে, মশায়। তা হলে গান কি রকম জমিয়ে দেব দেখতে পাবেন। পেটে খেলে পিঠে সয়। মূলোর শুক্তো খেয়ে কি এ্যাকটো করা যায়—বলুন।

এ-গ্রামে সে-গ্রামে প্রত্যহ গাওনা লাগিয়া আছে। কীর্তিনারায়ণকেও নেশায় পাইয়াছে, ইতিমধ্যে দিন তিনেক চুরি করিয়া শুনিয়া গিয়াছে। একই পালা দু-তিনবার দেখিয়াও তৃপ্তি হয় না। ভানুচাঁদ সব দিন যাইতে চায় না, তখন একাই চলিয়া যায়। কোঁচার কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া চাষাভুষা জন-মজুর ঢালি-লাঠিয়ালদের মধ্যে ঘাড় গুঁজিয়া বসে, কেউ যাহাতে চিনিতে না পারে।

অঘোরের সঙ্গে আলাপও হইয়াছে। ভাল লোক অঘোর—কীর্তিনারায়ণের চেহারা দেখিয়া বলিয়াছে, সে যদি দলে আসে শিখাইয়া পড়াইয়া তাকে এমন কি বিশাখার পাঠও দিতে রাজি আছে।

একদিন এক কাণ্ড হইল। বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে, শ্যামকান্ত সহসা কীর্তিনারায়ণের হাত আঁটিয়া ধরিল।

কোথায় যাও?

আমতা-আমতা করিয়া কীর্তিনারায়ণ বলে, এই—বাইরে একটুখানি। আবার এখুনি আসব।

হাত ছাড়িয়া শ্যামাকান্ত তার কোঁচার খুঁট ধরিল।

রোজই তুমি চলে যাও, আমি জানি।

মিথ্যে কথা।

কাল গিয়েছিলে। পরশুও। কাউকে কিছু বলি নি, দেখছি তোমার দৌড়—

কীর্তিনারায়ণ তথাপি সামলাইবার চেষ্টা করে। যাব আর কোথায়? গরম লাগে, বারাণ্ডায় ঘোরাফেরা করি একটু।

ঘরের দরজা খোলা রেখে তুমি চলে যাও—

কীর্তিনারায়ণ চটিয়া গিয়া বলে, থাকলই বা দরজা খোলা। ঘরের মধ্যে কিসের ভয়? কাপুরুষ!

পরক্ষণেই আবার খোশামোদের ভাবে বলে, বলে দাও নি যে—ভাল করেছ, চমৎকার করেছ। নিজেদের কথা বাইরে বলা কি ভাল? কাল পদ্মের চাক তুলে এনে খাওয়াব তোমায়। ঘাড় নাড়ছ—আচ্ছা, কি চাও তবে?

শ্যামকান্ত যা চাহিল, কীর্তিনারায়ণ শুনিয়া অবাক। এই সব আদর্শ-ছেলেদের মনেও এমন শখ জাগে তাহা হইলে? শ্যামকান্ত বলিল, আমি যাব তোমার সঙ্গে। যাত্রা শুনব।

না, লক্ষ্মী। ননীর পুতুল তুমি—শেষকালে বিপদ ঘটিয়ে বোসো! বৃষ্টি হয়ে গেছে—পথে নেমেই তো পা পিছলে আছাড় খেতে শুরু করবে। সকালবেলা শুনব, সান্নিপাতিক জ্বরবিকারে ধরেছে।

শ্যামকান্ত রুষ্টচোখে চাহিয়া আছে। কিন্তু সাহসে কুলায় না কীর্তিনারায়ণের। এখন একটা ঝোঁক হইয়াছে, গান শুনিয়া ফিরিবার সময়ের অবস্থাটা আন্দাজ করিতে পারিতেছে না। অবশেষে বিরক্ত হইয়া ঝাঁজের সঙ্গে বলিল, আমি যাচ্ছি না। ক্ষমা দেও, এই শুয়ে পড়লাম। হল?

কিন্তু মনে মনে সে অধীর হইয়া উঠিতেছে। গান মালাধর সেনের বাড়ি। বউভাসির চকের সে তহ্‌শিলদার, স্থানীয় লোক—শ্যামগঞ্জের পূর্বপ্রান্তে তার বাড়ি। খুব হুঁশিয়ার লোকটি। ধানের সময়টা এই সর্বসমেত মাস তিন-চার মাত্র বরিশাল সদর-কাছারি হইতে একজন নায়েব পাইক-বরকন্দাজ লইয়া আদায়পত্র তদারক করিতে আসেন। সেই কয়মাস মালাধরের চণ্ডীমণ্ডপে খুব জাঁকাইয়া কাছারি বসে। বাকি সময়টা একাই সে সর্বেসর্বা, তার উপর কথা বলিবার কেউ নাই। সেই চণ্ডীমণ্ডপের সামনে আসর। দু-ক্রোশ তিন ক্রোশ পথ ভাঙিয়া কতবার কীর্তিকনারায়ণ গিয়া পালা শুনিয়া আসিয়াছে, আর এক রকম ঘরের দুয়ারে বলিলে হয়—এখানে যাওয়া ঘটিবে না? অনেকক্ষণ ধরিয়া শ্যামকান্তর সঙ্গে আজে-বাজে বকিয়া তার গা টিপিয়া কপালে হাত বুলাইয়া দিয়া অনেক কষ্টে তাকে ঘুম পাড়াইল।

একা যাইতেছে। মেঘ সরিয়া ম্লান জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে এতক্ষণে। বাঁচোয়া—বৃষ্টির জন্য যাত্রা ভাঙিবার সম্ভাবনা আর রহিল না। বাঁশবন। এই জায়গাটায় আসিলে ভয় করে, কীর্তিনারায়ণের গান ধরিতে ইচ্ছা করে। কৈলাস কর্মকার গল্প করে, ঝিকরগাছার হাটে গরু কিনিয়া একবার অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরিতেছিল। এইখানে আসিয়া দেখিল, অতিকায় একটা মানুষের মতো, মুণ্ড নাই, নুইয়া-পড়া একটা বাঁশ দু-হাতে ধরিয়া দোল খাইতেছে। নিজের চোখে

স্পষ্ট দেখিয়াছে কৈলাস; কেহ অবিশ্বাস করিলে সে গা ছুঁইয়া বলিতে যায়।

ক্যাঁচকোঁচ বাঁশবনে শব্দ উঠিতেছে। যেন একটা ষড়যন্ত্র—অপদেবতাদের কারসাজি। কীর্তিনারায়ণকে একলা পথে দেখিয়া ভয় দিতেছে। বাঁশের আগা হইতে ঝুল খাইয়া হঠাৎ কন্ধ-কাটা কেহ যদি লাফাইয়া পড়ে! দম ভরে 'রাম' 'রাম' বলিতে বলিতে সে দৌড় দিল। রাম-নাম মুখে থাকিলে ভূত-প্রেতের কিছু করিবার জো নাই।

এক দৌড়ে অন্ধকার অংশটা পার হইয়া কীর্তিনারায়ণ মাঠে আসিয়া পড়িল। মানুষ-জনের শব্দ-সাড়া আসিতেছে, আর ভয় নাই। এ্যাকটো হইতেছে, ক্রমশ স্পষ্ট শোনা যাইতে লাগিল। পিছনের একটা জায়গায় কীর্তিনারায়ণ বসিয়া পড়িল। কিন্তু ভিন্ন গ্রামে দূরের জায়গায় যাহা চলে, গ্রামের ভিতর তাহা চলিল না। কে-একজন চিনিতে পারিয়া চুপি-চুপি মালাধরকে গিয়া বলিল। মালাধর ছুটিয়া আসিল।

এখানে কেন ঘোষ মশায়? সামিয়ানার নিচে চৌকি পেতে রেখেছি তা হলে কাদের জন্যে? আসতে আজ্ঞা হোক, হুজুর।

মালাধর নিচু হইয়া অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে পিছু হাঁটিতেছে। শিবনারায়ণের ছেলে বিনা আহ্বানে যাত্রা শুনিতে আসিয়াছে, সকলে অবাক হইয়াছে, সরিয়া পথ করিয়া দিতেছে।

মজা লাগিতেছে কীর্তিনারায়ণের, হাসিও পাইতেছে। কতটুকু সে—মালাধর তবু তাকে 'হুজুর' 'ঘোষ মশায়' বলিয়া আহ্বান করিতেছে, আর এই রকম অতিরিক্ত বিনয় দেখাইতেছে। ধীর ভাবে গিয়া সে আসরের চৌকির উপরে বসিল, যেন এমনি ব্যাপারে সে প্রতিনিয়ত অভ্যস্ত। একটা থালা পাতিয়া রাখা হইয়াছে, লোকে পেলা দিতেছে, ঝনাঝন সিকি-দুয়ানি পড়িতেছে। খাসা লাগিতেছে কীর্তিনারায়ণের। তাললয় তো বোঝে ছাই—তবু নরহরির অনুকরণে

চৌকির উপর মৃদু আঘাত দিতেছে এক একবার। পিছন হইতে কাঁধের উপর হঠাৎ একখানা হাত আসিয়া পড়িল। আসরের লোকজন যেন জমিয়া গিয়াছে। সকলের চক্ষু গানের দিকে নয়—এই দিকে। শিবনারায়ণ আর নরহরি এই রাত্রে চলিয়া আসিয়াছেন, নরহরি হাত রাখিয়াছেন কীর্তিনারায়ণের কাঁধের উপর।

মুহূর্তে সোরগোল পড়িয়া গেল। আজ কি হইতেছে বল তো—এ সমস্ত যে স্বপ্নের অগোচর! অভ্যর্থনার জন্য অনেকে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, দস্তুর-মতো ভিড় জমিয়া গেল ইহাদের ঘিরিয়া। পরে একটু ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে খেয়াল হইল, কীর্তিনারায়ণ ইতিমধ্যে ফাঁক বুঝিয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

গায়েনদের উদ্দেশ্যে নরহরি বলিলেন, তোমরা থেমে গেলে কেন? গান মাটি কোরো না, চালাও—

অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও চৌকির উপর তাঁরা বসিলেন না। নরহরির আপত্তি ছিল না—কিন্তু শিবনারায়ণের দিকে চাহিয়া ইচ্ছাটা আপাতত সংযত করিতে হইল। যে গানটা চলিতেছিল, দাঁড়াইয়া তার শেষ অবধি শুনিলেন। তারপর নরহরি প্রশ্ন করিলেন, অধিকারী কোথায়?

অঘোর আসিয়া নত মস্তকে পায়ের ধুলা লইল। নরহরি বলিলেন, সকাল বেলা দেখা করবে। দরকার আছে।

তারপর অলক্ষ্য অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, কীর্তি এই যে এখানে ছিল, কোথায় পালাল—ডেকে দাও দিকি—

না না, কাজ নেই—আপনি যাবে, কারো তোমাদের ব্যস্ত হতে হবে না। শিবনারায়ণ নরহরির হাত ধরিয়া টানিলেন। চলো—এখানে একটা হাঙ্গামা করে এদের আসর মাটি করব না।

দোতলার অলিন্দে সৌদামিনী ইঁহাদেরই জন্য বসিয়াছিলেন। ফিরিয়াছেন দেখিয়া নামিয়া আসিলেন। শ্যামকান্তও দরজা খুলিয়া আসিল।

পাওয়া গেল না?

শিবনারায়ণ একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

শ্যামকান্ত বলিল, আমি কথা বের করে নিয়েছিলাম বাবা। একটু ঘুমের ভাব এসেছিল, অমনি পালিয়েছে। ঠিক ঐখানে আছে। কোথায় ঘাড় গুঁজে বসে আছে, তোমরা খুঁজে পেলে না।

নরহরি হাসিয়া বলিলেন, পেয়েছিলাম বই কি, পিছলে সরে গেল। দেখুন দিকি বউঠান, এসে আবার ভালমানুষ হয়ে শুয়ে পড়েছে কিনা?

সৌদামিনী বলিলেন, যাই বলুন চৌধুরি মশায়, বড্ড রাগ কিন্তু আপনাদের। রাত্তিরবেলা নিজেদের যাবার গরজটা কি ছিল? কাউকে পাঠিয়ে দিলেই হত।

নরহরি বলিলেন, ভায়ার কথা বলতে পারি নে—আমি গিয়েছিলাম কিন্তু রাগ করে নয়। শুনবার লোভ ছিল, কি এমন গান—যার জন্য কীর্তি রোজ রোজ পাগল হয়ে বেরিয়ে যায়! এখন রাগ হচ্ছে। এই শুনবার জন্য এত?

কীর্তিনারায়ণ আর আসরের মধ্যে আসে নাই। অন্ধকারে বসিয়াছিল, গান ভাঙিলে লোকজন চলিয়া গেলে আসিল। বয়সের বিস্তর তফাৎ সত্ত্বেও অঘোর ইতিমধ্যে অভিন্নহৃদয় বন্ধু হইয়া উঠিয়াছে; তার সঙ্গে পরামর্শের প্রয়োজন। অঘোরও বিশেষ ভাবনায় পড়িয়াছে, নরহরি তাকে ডাকিয়া গেলেন কেন? কীর্তিনারায়ণ নিজে চলিয়া আসে, সে তো কখনো বাড়ি হইতে ডাকিতে যায় না। তার উপর আক্রোশ কেন তবে? নরহরি চৌধুরি নিজে আসিয়া ডাকিয়া গিয়াছেন, না গিয়া কোনক্রমে উপায় নাই। সাব্যস্ত হইল, কাল সকালে দু-জনে কিছু আগ-পাছ হইয়া যাইবে।

যাত্রাওয়ালাদের সঙ্গে ডাল-ভাত খাইয়া উহাদেরই সতরঞ্চির একপাশে শুইয়া কীর্তিনারায়ণ রাত কাটাইল। রোজ সৌদামিনী বারম্বার উঠিয়া তাদের মশারি গুঁজিয়া দিয়া যান, যাহাতে মশা ঢুকিয়া গায়ে বসিতে না পারে। আজ একা শ্যামকান্ত ঘুমাইতেছে। অভ্যাসমতো সেই ঘরে আসিয়া সৌদামিনী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন, তারপর ধীরে ধীরে শয্যাপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন। দশমীর চাঁদ ডুবিয়া চারিদিক অন্ধকার হইল। নিঃশব্দে তিনি বসিয়া রহিলেন।

অনেক রকম যুক্তি আঁটিয়া অঘোরকে লইয়া কীর্তিনারায়ণ বাড়ি ঢুকিল। নিজে দরজার কাছে দাঁড়াইল, অঘোর আগাইয়া গেল। নরহরি মুখ তুলিয়া অঘোরের দিকে চাহিলেন।

তোমার সঙ্গে আগে মিটিয়ে নিই। বোসো—

শিবনারায়ণ সদর-উঠান দিয়া যাইতেছিলেন। কীর্তিনারায়ণকে দেখিয়া দ্রুত পায়ে আসিয়া তাহার হাত ধরিলেন।

এসো—

নরহরি অনুনয়ের সুরে বলিলেন, একদিন একটা অন্যায় করে ফেলেছে—মার-ধোর কোরো না ওকে।

শিবনারায়ণ হাসিয়া ফেলিলেন।

মেরে মনের মোড় ফেরানো যায় না—আমি জানি, নরহরি। পালিয়ে যাব ভাবছি একে নিয়ে।

ছেলেকে এক রকম টানিয়া লইয়া শিবনারায়ণ অন্দর-বাড়ির দিকে চলিয়া গেলেন।

নরহরি ক্ষণকাল সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁরও দু-একটা কথা ছিল কীর্তিনারায়ণের সঙ্গে। এই গান শুনিতে সে কষ্ট করিয়া যায়—রুচির জঘন্যতা লইয়া গালিগালাজ করিবেন, ভাবিয়াছিলেন। আপাতত তাহা হইল না।

মুখ ফিরাইয়া তারপর বলিলেন, দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন ? বোসো অধিকারী—

বসিবে কি, কথাবার্তার ধরণে অঘোর অবাক হইয়া গিয়াছে। কি মিটাইয়া লইবেন, মিটাইবার মতো ইতিমধ্যে কি ঘটিয়াছে চৌধুরি মশায়ের সঙ্গে ?

নরহরি বলিলেন, তোমাকে খুন করা উচিত।

অঘোর ঘামিয়া উঠিয়াছে। আজ্ঞে—

ও-রকম পালা গাও কেন ?

বেকুবের মতো অঘোর চাহিয়া আছে। নরহরি বলিলেন, গান গাওয়া নয়, ও হল সরস্বতীর মাথায় মুগুর মারা। তোমার দলের নাম শুনে গিয়েছিলাম, টিকতে পারলাম না।

অঘোর বলিল, বাঁধনদার যেমন বেঁধে দিয়েছে, হুজুর।

পালা না বেঁধে ভূঁয়ে কোদাল মারতে বোলো তাকে।

এত নামডাক অঘোর অধিকারীর, তার সম্বন্ধে এই মন্তব্য ! একটু অভিমানের সঙ্গে অঘোর বলে, একটা ভাল পালা আপনি যদি বেঁধে দেন চৌধুরি মশায়—

তাই ভেবেছি আমি কাল সমস্ত রাত। ছড়া নয়—পালা বাঁধব এবার থেকে।

একটুখানি ভাবিয়া বলিলেন, আগামী অমাবস্যায় মন্দির-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছে করছি। নির্বিঘ্নে যদি সমাধা হয়ে যায়, তারপর কাজকর্ম কিছু নেই—শিব-নারায়ণের দাপে অঢেল ছুটি—পালা-ই বাঁধব, ঠিক করলাম। শম্ভু-নিশম্ভু বধ—ভয়ঙ্করা নৃত্যপরা দিগম্বরী মা-জননী, এক হাতে রক্তমাখা খাড়া আর এক হাতে ছিন্নমুণ্ড অসুর। গায়ের রক্ত গরম হয়ে ওঠে, কি বল অধিকারী ?

ভাবাবেগে উঠিয়া আসিয়া নরহরি অঘোরের হাত জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, আমি বলি কি, কৃষ্ণ-যাত্রা ছেড়ে দিয়ে তুমি বরঞ্চ কালী-কীর্তন শুরু করে দাও। ও গানের তুলনা নেই।

শিবনারায়ণ সৌদামিনীকে বলিতেছিলেন, পালাতে হবে বড় বউ। এরা ভিন্ন ধাতুতে গড়া, এ জায়গা আমাদের নয়। ছেলের কচি বয়স, নমনীয় মন—এদের সঙ্গে পড়ে বিষম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে।

নরহরি এই সময়ে আসিয়া বলিলেন, মন্দির আর দীঘি তো শেষ হয়ে গেল। আগামী অমাবস্যায় প্রতিষ্ঠা করব, মনস্থ করেছি।

বলিতেছেন আর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শিবনারায়ণের মুখ-ভাব নিরীক্ষণ করিতেছেন। বলিলেন, কিন্তু তোমার আপত্তি থাকে তো বল, উৎসব আমি বন্ধ করে দেব।

শিবনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন, ধুমধাম করে তুমি তোমার ইষ্টদেবীর পূজা করবে, আমি কেন আপত্তি করতে যাব ভাই ?

কথা লুফিয়া লইয়া নরহরি বলিলেন, ঠিক কথা ! যে কালী সেই তো কৃষ্ণ। তবু তুমি চলে যেতে চাচ্ছ !

এ জন্য নয় হরি-ভাই। ছেলে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। অহরহ মনে হয়, আমার পিতৃকৃত্যে অপরাধ ঘটছে। আর তোমাদেরও অসুবিধার কারণ হয়ে উঠছি দিন দিন।

নরহরি রাগ করিয়া বলিলেন, তোমার কানে কে এই সব মিথ্যেকথা ঢোকায় বল তো ? সৌভাগ্য উছলে পড়ছে, শ্যামশরণের আমল ফিরে আসছে শ্যামগঞ্জে—আর অসুবিধার কারণ হলে তোমরা ?

মিথ্যে আশা—শ্যামশরণের দিন আর ফিরবে না। অতীত কখনো ফিরে আসে না, হরি-ভাই।

কিন্তু যেটা আসল আপত্তি বলিয়া নরহরির বিশ্বাস, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই প্রসঙ্গে তিনি আসিলেন। তোমার শ্যামঠাকুরের জন্যও নূতন মন্দির গড়ব এর পর। হাসছ কেন ভাই, আমি সেখানেও অঞ্জলি দেব, দেখো।

শিবনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন, খবরদার, ঐটি কোরো না। শ্যামঠাকুরের

অঞ্জলির মন্ত্র পড়বার সময় তোমার মনে আর মুখে অমিল হবে। ভাবের ঘরে চুরি করতে যেও না।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন, ঐ যদি সত্যি সত্যি মনের ইচ্ছা, আপাতত তবে সড়কিওয়ালাগুলোকে বিদেয় কর দিকি। ওদের আর রেখেছ কেন?

আজকে দরকার হচ্ছে না—কিন্তু কোনদিন দরকার হবে না, তাই কি কেউ বলতে পারে?

শিবনারায়ণ বলিলেন, শ্যামঠাকুরের মন্দির গড়াতে চাচ্ছ, কিন্তু চকচকে ফলা দেখে প্রেমের ঠাকুর এ বাড়ির দেউড়ি দিয়ে ঢুকতে ভরসা পাবেন না যে!

নরহরি একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। সেই প্রথম পরিচয়-দিনের লাঞ্ছনা এখনো তিনি ভুলিতে পারেন নাই। বলিলেন, আর তোমার লাঠি? সে যে বিশটা সড়কির মহড়া নেয়, ভাই। তুমি যখন লাঠি চালাও, ঠাকুর ভাবেন বুঝি ফুল ছড়ানো হচ্ছে?

মধুর হাসিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, কোথায় লাঠি? লাঠি তারপর আমি মালঞ্চে ভাসিয়ে দিয়েছি। কুড়িয়ে নিয়ে ঠাকুর বাঁশী করেছেন। সেই বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে তিনি ডাকেন।

নরহরি বিস্মিত চোখে শিবনারায়ণের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। দূরের মানুষ অনেক করিয়া কাছে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, আবার তিনি দূরবর্তী হইতেছেন—ঐ দৃষ্টিতে আর কথার সুরে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। কাতর কণ্ঠে নরহরি বলিলেন, তোমার কোথাও যাওয়া হবে না বন্ধু, যেতে আমি দেব না। তোমার যখন ইচ্ছে নয়, কীর্তির সঙ্গে কথাই বলব না আর আমি। তোমার ছেলে—যা-ই আমার ইচ্ছে হোক, আমার পথে আমি তাকে নিতে যাব কেন?

ইহার পর নরহরি একটিমাত্র কথা বলিয়াছিলেন কীর্তিনারায়ণের সঙ্গে।

ভায়া আমাদের ছেড়ে যাবে-যাবে করছে। তুমি বাপু মন দিয়ে পড়াশুনো কর। আর কখনো আমার কাছে এসো না।

বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া উঠিল। চোখে কখনো জল আসে না নরহরি চৌধুরির। আর এক দিকে চাহিয়া সহসা তিনি স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

(৯)

ইহার পর দিন কতক কীর্তিনারায়ণ পড়াশুনায় খুব মনোযোগ দিল। নিয়মিত পাঠশালায় যাইতেছে, সন্ধ্যার পর রেড়ির তেলের দীপের সামনে যথারীতি পাঠ অভ্যাস করে। অঘোরের দলও অঞ্চল ছাড়িয়া বিদায় হইয়াছে, রাত্রে বাহির হইবার আপাতত কোন উপলক্ষ নাই।

কিন্তু বড় দায় ঠেকিয়াছে শুভঙ্করী লইয়া। কিছুতে রপ্ত হয় না। মণকষা কষিতে গিয়া কাঠাকালির আর্যা আওড়াইতে থাকে। শুভঙ্করীর সে নাম দিয়াছে ভয়ঙ্করী। এ ভাবে ধস্তাধস্তি করিয়া. আর চলে না। বাপ রাগ করুন আর যা-ই করুন, নরহরি যতই বোঝান, অতঃপর ইস্তফা না দিয়া আর উপায় নাই।

কিন্তু ভূগোলশাস্ত্রটা শুনিতে বড় কৌতুক লাগে। কীর্তিনারায়ণ নিজে পড়ে না—এখনো তার সময় হয় নাই। কোনদিন যে আসিবে, সে বিষয়ে দস্তুরমতো সন্দেহ—অন্তত পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তো সজোরে ঘাড় নাড়িবেন। কিন্তু বৃত্তি-পরীক্ষা দিবে, এমন ভাল ছাত্রও দু-পাঁচ জন আছে। তাদের কাছে মুরারি যখন ভূগোল বুঝাইতে শুরু করেন, প্রতিটি কথা কীর্তি-নারায়ণ যেন হাঁ করিয়া গিলে। গ্রামের সামান্য পাঠশালা—সাকুল্যে দু-খানা মানচিত্র, পৃথিবী ও ভারতবর্ষ—তাহাতেই কাজ চলিয়া যায়। পণ্ডিত ভারত-বর্ষের কথা বলেন, এক একদিন এক এক রকম পরিচয় দেন, ইতিহাসের প্রসঙ্গও ওঠে কখনো কখনো। রাজরাজড়ার উত্থান-পতনের কাহিনী নিতান্ত

নিরাসক্ত ভাবে কীর্তিনারায়ণ শুনিয়া যায়। এই শ্যামগঞ্জ হইতে নৌকাযোগে কসবা যাইতে পুরা একটা দিন লাগিয়া যায়। রেলগাড়ির নাম শুনিয়াছে—কিন্তু চোখে দেখার ভাগ্য অদ্যাপি হইয়া উঠে নাই। অনেক দূরের দিল্লি নগরীর ঐ সব রাজকীয় জয়-পরাজয়ের সহিত এই শ্যামগঞ্জ এই পাঠশালা ঢালিপাড়া তার নিজের বাড়ি অঘোরের দলের গায়েনরা—ইহাদের কোন প্রকার যোগাযোগ আছে, বালকের তাহা ধারণায় আসে না। কিন্তু সে চেষ্টা করে ইতিহাসের কাহিনী আর ভূগোলের নিসর্গ-বৈচিত্র্য জুড়িয়া গাঁথিয়া ভারতবর্ষের সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে। পণ্ডিত বলেন, সোনার দেশ নাকি এই ভারতবর্ষ, আমাদের জন্মভূমি! কত পাহাড়-পর্বত নদ-নদী সমুদ্র-মরুভূমি হ্রদ-প্রান্তর শহর-গ্রাম এখানে! কত বিচিত্র ধরণের মানুষ!

ভাঁটির দেশের ছেলে, নদ-নদী তার অজানা নয়। পাহাড়-পর্বত? দীঘির পাড় উঁচু; আরও অনেক—অনেক উঁচু ও বহুদূরব্যাপী হইলেই পাহাড় হইয়া দাঁড়াইত। আর দীঘিটা এমনই তো প্রায় একটা হ্রদ। ধান কাটিয়া লইয়া যাইবার পর শীতের শেষাশেষি চিতলমারি ও নাককাটির খালের মাঝামাঝি চকগুলা একেবারে শুকাইয়া যায়, নিঃসীম মাঠ খা-খা করে, ইহাই তো মরুভূমি। আবার ভরা বর্ষায় চেহারা দেখ গিয়া ঐ সব চকের—মরুভূমি তখন সাগর হইয়া গিয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষকে কীর্তিনারায়ণ তাদের ছোট শ্যামগঞ্জ বরণডাঙা ও আশপাশের দু-চারটা গ্রামের মধ্যে কল্পনা করিতে চায়। ভারতবর্ষকে সে চেনে না, জানে না। ম্যাপের উপর নানা রং ও রেখা দেখিয়া বিশেষ কিছু ধারণায় আসে না তার।

একদিন পণ্ডিতকে ধরিয়া বসিল, ভারতবর্ষের কোথায় তাদের এই শ্যামগঞ্জ —মানচিত্রে দেখাইয়া দিতে হইবে। মুরারি জানেন, একেবারে পণ্ডশ্রম। তা ছাড়া কীর্তিনারায়ণ হেন ছাত্রের এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়া তিনি কিছু অবাক হইলেন। একেবারে নাছোড়বান্দা—তার হাত কিছুতে এড়ানো গেল না। পণ্ডিত মানচিত্র খুলিলেন। গ্রাম তো পাওয়াই যাইবে না, থানা খুঁজিতে

লাগিলেন। নাই। মহাকুমা? তাহাও নাই। অনেক কষ্টে অবশেষে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে পাওয়া গেল জেলার নামটি—স্পষ্ট নয়, প্রায় আন্দাজে পড়িতে হয়।

সহস্র যোজনব্যাপ্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এত ছোট এবং সামান্য তাদের অঞ্চলটা!

(১০)

এক দুর্ঘটনা ঘটিল। একটি মেয়ে প্রসব করিয়া আঁতুড়ঘরে নরহরির স্ত্রী মারা গেলেন। মেয়েটি বাঁচিয়া রহিল—ফুটফুটে চমৎকার মেয়ে।

শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটিলে আরও কিছুকাল পরে মন্দির-প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল।

মাসকয়েক কাটিল। প্রতি অমাবস্যায় মহাকালীর পূজা হয়। শ্যামঠাকুরের মন্দির তৈয়ারির প্রসঙ্গ আপাতত চাপা পড়িয়া গিয়াছে। নরহরি মন-রাখা কথা মাত্র বলিয়াছিলেন, শিবনারায়ণ তাহা জানেন। ইহা লইয়া তাই উচ্চবাচ্য করেন না।

নরহরি লক্ষ্য করিয়াছেন, দেবীর পূজার সময় শিবনারায়ণ উপস্থিত থাকেন না। খুঁজিয়া-পাতিয়া যদিই বা ডাকিয়া আনেন, বলির সময় তিনি চোখ বোজেন, দু-হাতে কান চাপিয়া ধরেন।

নরহরি বলেন, ছি—ছি!

শিবনারায়ণ বলেন, কি করব ভাই, ঢাকের বাজনা সহ্য করতে পারি না—মাথার ভিতর কেমন করে ওঠে।

নরহরি ব্যথিত কণ্ঠে বলেন, শ্যামের বাঁশী তোমার মাথা খেয়ে দিয়েছে।

এক রাত্রে পূজার সময় সমস্ত বাড়ি পাতি-পাতি করিয়া খোঁজা হইল। শিবনারায়ণ নাই। অনেক কথা নরহরির কানে আসিয়াছে। তিনি আর অঞ্জলির মন্ত্র পড়িয়া উঠিতে পারেন না, চোখে জল আসিবার মতো হয়, গলা

আটকাইয়া যায়। পূজা-শেষে তখনো অল্প রাত্রি আছে। কাহাকেও কিছু বলিলেন না, নিঃশব্দে তিনি চিতলমারির খালের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। হাঁ—মৃদঙ্গের আওয়াজ আসিতেছে বটে, কিছুদিন ধরিয়া যাহা শুনিতেছেন, তাহাতে আজ নিঃসন্দেহ হইলেন।

জলের উপর ঝুঁকিয়া-পড়া কেওড়া-ডালের সঙ্গে খেয়া-নৌকা বাঁধা আছে। তাহাতে চড়িয়া বৈঠার অভাবে দু-হাতে জল কাটিয়া অনেক কষ্টে বরণডাঙার পারে নামিলেন। হনহন করিয়া মাধবদাস বাবাজির আখড়ার দিকে চলিলেন।

গিয়া দেখিলেন—এতখানি তিনি কল্পনা করিতে পারেন নাই। অঙ্গনে সঙ্কীর্তন হইতেছে—শিবনারায়ণের চোখে দরদর ধারা, সম্বিৎ নাই, আকুল হইয়া গায়ককেই এক-একবার আলিঙ্গন করিতেছেন। নরহরির চোখ জ্বলিয়া উঠিল। বজ্রকণ্ঠে ডাকিলেন, বন্ধু!

সে ডাক শিবনারায়ণের কানে গেল না। মাধবদাস বাবাজি তাকাইলেন। তটস্থ হইয়া তাড়াতাড়ি তিনি অভ্যর্থনা করিলেন, বসতে আজ্ঞা হোক চৌধুরি মশায়—

না।

সকল অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া তখনই অন্ধকার পথে নরহরি ফিরিলেন।

পরদিন সমস্তটা দিন কাটিয়া গেল, দুই বন্ধুতে কথাবার্তা নাই। দেখা হইলে নরহরি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যান। বিকালবেলা কাঁধে চাদর ফেলিয়া শিবনারায়ণ বাহির হইয়া গেলেন। নরহরি চাহিয়া দেখিলেন, দেখিয়া গুম হইয়া রহিলেন।

আগে সঙ্কোচ যদিই বা কিছু ছিল, ক্রমশ তাহা দূর হইয়া গেল। এখন শিবনারায়ণ শুধু রাত্রিটা নয়—সকালে অনেক বেলা অবধি আখড়ায় পড়িয়া থাকেন। প্রজাপাটক দেখা পায় না, কাছারি-বাড়িতে ক্রমশ তিনি দুর্লভ হইয়া উঠিতেছেন।

এক সন্ধ্যায় রওনা হইতেছেন, দেখিলেন বাহির হইতে দরজা বন্ধ। সবিস্ময়ে শিবনারায়ণ প্রশ্ন করিলেন, কে আছ ?

দশ-পনের জন ঢালি জানলার কাছে মাথা নিচু করিয়া আসিল। ঢাল-সড়কি হাতে বাহিরে বসিয়া তারা পাহারা দিতেছে। শিবনারায়ণ খুব হাসিতে লাগিলেন. যেন কত বড় একটা মজার ব্যাপার ! বলিলেন, আমাকে তোমরা কয়েদ করে রাখলে নাকি ?

রঘুনাথ জিভ কাটিয়া সরিয়া গেল ; চিন্তামণি উদ্দেশে বাহির হইতে গড় হইয়া প্রণাম করিল। বলিল, আমরা কিছু জানি নে কর্তা। চৌধুরি মশায় বলে দিলেন এখানে বসে থাকতে, তাই—

শিবনারায়ণ তেমনি হাসিতে লাগিলেন। মধুর স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, চৌধুরি মশায় তো তোমাদের একলা মনিব নন, ওস্তাদ।

চিন্তামণি জিজ্ঞাসা করিল, খুলব দরজা ?

শিবনারায়ণ গম্ভীর হইলেন। মুহূর্তকাল ভাবিয়া বলিলেন, না—সে হয় না। হুকুম আমাদের মধ্যে যে দেবে, রদ করতে পারে সে-ই। নরহরির হুকুম আমি ভাঙতে বলি কি করে ? তোমরা সব বসে থাক, যেমন আছ।

রাত্রি নিষুপ্ত হইল। মালঞ্চে জোয়ার আসিয়াছে, তার মৃদু কল্লোল শোনা যাইতেছে। উহার চেয়েও মৃদুতর হইয়া বাতাসের সঙ্গে এক-একবার বরণডাঙার পার হইতে মৃদঙ্গ ও রামশিঙার আওয়াজ আসিতেছে। উজান বহিয়া-যাওয়া যমুনার তটভূমিতে শ্যামসুন্দর বুঝি নিশিরাত্রে বাঁশী বাজাইতেছেন। দরজা বন্ধ—সেখানে ছুটিয়া যাইবার উপায় নাই। শিবনারায়ণ বৃথাই বড় বড় পেরেক-আঁটা জানালায় হাত চাপড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

সকালবেলা শিবনারায়ণ নরহরিকে আর পাশ কাটাইতে দিলেন না। বলিলেন, নরহরি ভাই, পাঁচখানা চকের সমস্ত প্রজা শাসিত হয়ে গেছে—এবার কি আমার পালা ?

গম্ভীর কণ্ঠে নরহরি বলিলেন, না, মাধবদাসের।

শিবনারায়ণ শিহরিয়া তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়িলেন।

না—না, স্বপ্নেও অমন কল্পনা কোরো না। মহাপুরুষ!

নরহরির গর্বদৃপ্ত মুখে এক মুহূর্তে কাতর অসহায় ছবি ফুটিয়া উঠিল। বলিল, মহাপুরুষ বই কি! জোলো-ডাকাত—ঘরদোর সাজিয়ে দশজনের একজন হতে যাচ্ছি, মহাপুরুষ আমার সোনার ঘর পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছেন, আমার সাধ-বাসনা ডুবিয়ে দিচ্ছেন—

ইদানীং নরহরির মনের জোর যেন কমিয়া যাইতেছে। যৌবন গিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছেন, সেই কথা প্রায়ই মনে আসে। গলা ধরিয়া আসিল। চোখে পাছে জল আসিয়া যায়, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি সরিয়া গেলেন।

সে রাত্রিতেও শিবনারায়ণ তেমনি দোতলার ঘরে জানলার গরাদে ধরিয়া আকুলি-বিকুলি করিতেছিলেন। নিশীথে চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া গেলে তিনি কান পাতিয়া রহিলেন। কিন্তু মৃদঙ্গের আওয়াজ আসে না। কতক্ষণ তিনি জানলা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সহসা দেখিতে পাইলেন, ওপারের আকাশ রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে, রাত্রির গাঢ় অন্ধকার বিমথিত করিয়া আগুনের শিখা লকলক করিয়া জ্বলিতেছে। লোহার গরাদে আর তাঁকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না, উন্মাদের মতো দরজায় লাথি মারিয়া ঘর ফাটাইয়া তিনি বারম্বার চিৎকার করিতে লাগিলেন, কে আছ—দুয়োর খোল। খোল—খোল—খুলে দাও শিগগির। নইলে ভেঙে ফেললাম।

খট করিয়া শিকল খুলিয়া গেল। কবাট খুলিয়া দিয়া মুখোমুখি দাঁড়াইয়া —আর কেহ নয়, স্বয়ং নরহরি। শিবনারায়ণের তিনি হাত ধরিয়া ফেলিলেন। হাত ছাড়াইয়া শুধু একটা কঠোর দৃষ্টি হানিয়া শিবনারায়ণ দ্রুত পায়ে নামিয়া গেলেন।

ভাব দেখিয়া নরহরির আতঙ্কের সীমা রহিল না। তিনি পিছু-পিছু ছুটিলেন।

কোথায় যাও ?

শিবনারায়ণ অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছেন। বারম্বার নরহরি ডাকিতে লাগিলেন, ফেরো বন্ধু, যেও না—

ঘাটে যে নৌকা সামনে পাইলেন, শিবনারায়ণ উঠিয়া বসিলেন। নজর শুধু ওপারের অগ্নিশিখার দিকে। কেমন করিয়া খাল পার হইলেন, কেমন করিয়া মাঠ ভাঙিয়া ছুটিয়া আখড়ায় পৌছিলেন, বলিতে পারেন না। গিয়া দেখিলেন, মাধবদাস বাবাজি অভিভূতের মতো দাঁড়াইয়া ধ্বংসলীলা দেখিতেছেন। আগুন লক্ষ নাগিনীর মতো ফুঁসিয়া বেড়াইতেছে। মাধবীকুঞ্জ গিয়াছে, মণ্ডপের চিহ্নমাত্র নাই, মন্দিরের খোড়ো চাল চাঁচের বেড়া দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। তারই আলোয় অনতিস্ফুট দেখা যায়, অলঙ্কার ও পট্টবাস-সজ্জিত হাস্যোদ্ভাসিত-শ্রীমুখ শ্যামসুন্দর-রাধারাণীর যুগল বিগ্রহ। হুড়মুড় করিয়া আড়া ভাঙিয়া পড়িল, বিগ্রহের কাপড়-চোপড় জ্বলিয়া উঠিল। মাধবদাস বুক চাপড়াইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, পুড়ে মরল, ঐ কাঁদছে ওরা—কাঁদছে, কাঁদছে—তোমরা এসো, বাঁচাও—

লেলিহান আগুনের মধ্যে অশীতিপর বাবাজি ঝাঁপ দিলেন, শিবনারায়ণ ঝাঁপ দিলেন, আরও অনেকে দিল। শ্যামঠাকুরের বিগ্রহ কোলে লইয়া শিবনারায়ণ দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে মন্দিরের চাল ভাঙিয়া-চুরিয়া করাল অগ্নিগর্ভে গড়াইয়া পড়িল। শিবনারায়ণ এক লাফে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইতে পারিলেন না, ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। অগ্নিদগ্ধ সর্বাঙ্গে বিষম জ্বালা করিতেছে, এতক্ষণে শিবনারায়ণের অনুভব হইল।

কলসি কলসি জল ঢালিয়া অনেক কষ্টে আগুন নেভানো হইল। তখন সকাল হইয়া গেছে। ছাই ঠেলিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে পাওয়া গেল দগ্ধাবশেষ মাধব-দাসের গলিত মাংসপিণ্ড। রাধারাণীর প্রতিমা শতখণ্ড হইয়া গিয়াছে। বাবাজি মরিয়া গিয়াও তার একটি টুকরা ফেলেন নাই, প্রাণপণে আঁকড়াইয়া আছেন।

সেদিন শিবনারায়ণ আর শ্যামগঞ্জে ফিরিলেন না। পর দিন না, তার পরের দিনও না। নক্ষত্র-খচিত আকাশের নিচে অন্যান্য ভক্তের সঙ্গে পাশাপাশি শুইয়া রাত কাটাইলেন।

ক্রমে নরহরির রাগ পড়িয়া আসিল। তিনি লোক পাঠাইলেন, লোক ফিরিয়া গেল। তারপর নিজে চলিয়া আসিলেন। ছলছল চোখে কাতর হইয়া ডাকিলেন, বন্ধু, বাড়ি এসো—

চলো—

খাল পার হইয়া নরহরির পিছু-পিছু শিবনারায়ণ নিঃশব্দে বাড়ি ঢুকিলেন। দু'টা দিন কাটিয়াছে, ইহারই মধ্যে আগেকার সে শিবনারায়ণ নাই—অনেক দূরের লোক হইয়া গিয়াছেন। বাপের দশা দেখিয়া মালতী অবধি ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নরহরিও যেন তাঁর মুখের দিকে চাহিবার ভরসা পান না।

শিবনারায়ণ বলিলেন, নরহরি ভাই, আমার শ্যামঠাকুর গৃহহীন। রাধারাণী ভয় পেয়ে বাবাজির সঙ্গে পালিয়ে গেছেন। লোকে বলে, তোমার কাজ।

নরহরি অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। মুহূর্ত পরে বলিলেন, মহাকালীর অভিসম্পাত, বন্ধু। রক্তজবা পেলে মা খুশি হন, তোমার ঐ বোষ্টমেরা ঠাট্টা করে সেই জবার নাম দিয়েছে ওড়ফুল। আর মাকে ওরা কি বলে শুনেছ তো?

চোখোচোখি হইল। ইষ্টদেবীর অপমানের কথা উল্লেখ করিতে নরহরির মুখে-চোখে আগুন ঠিকরিয়া পড়িতেছে। বলিতে লাগিলেন, ঘৃণায় ওরা মায়ের নামটাও উচ্চারণ করে না। মহাকালীর নাম দিয়েছে মহাভূষো—

দৃঢ় অথচ উত্তেজনাবিহীন কণ্ঠে শিবনারায়ণ বলিতে লাগিলেন, রাধারাণীর আমি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব, আর শ্যামঠাকুরের মঠ-বাড়ি তৈরি করে দেব ঠিক ঐ রকম—

মহাকালীর বিশাল মন্দিরের দিকে আঙুল নির্দেশ করিয়া শিবনারায়ণ চুপ করিলেন।

মায়ের মন্দিরের মতো হবে ন্যাড়ানেড়ির মঠ ?

অসহ্য উত্তেজনায় নরহরির মুখে কথা ফোটে না। ক্ষণপরে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, আর তুমি বোধ হয় কণ্ঠি পরে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে 'জয় রাধেকৃষ্ণ' বলে বেরিয়ে পড়বে! এই স্থির করেছ, বন্ধু ?

দুই অঞ্চলের দু'টি মানুষ এক রাত্রে মালঞ্চের উপর কোলাকুলি করিয়াছিলেন। তারপর শ্যামগঞ্জের প্রাচীন পাষাণ-অলিন্দে পাশাপাশি তাঁদের কত দিন-রাত্রি কাটিয়াছে! চক বন্দোবস্তের সময়, চক হাসিলের মুখে, মাঠে-ঘাটে জলে-জঙ্গলে নরহরি কত সাধ-বাসনার গল্প করিয়াছেন শিবনারায়ণের সঙ্গে, দু'টি আত্মার নিত্যসম্বন্ধের গর্ব করিয়াছেন। মাধবদাসের আখড়া পুড়িবার মাস ছয়-সাতের মধ্যে সব-কিছুরই মীমাংসা হইয়া গেল। পাঁচখানা চকের মধ্যে দু'খানা আর নগদ কিছু অর্থ শিবনারায়ণের ভাগে পড়িল। তাই লইয়া একদিন খুব সকালে তিনি চিতলমারির খাল-ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বুড়া চিন্তামণি কোথায় যেন গিয়াছিল আগের দিন। সে এসব কিছুই জানে না। দিন তিনেক পরে শ্যামগঞ্জে ফিরিয়া সেখান হইতে ধূলি-পায়ে একেবারে বরণডাঙায় চলিয়া আসিল।

শিবনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর কি ওস্তাদ ?

ফাঁকি দিয়ে এলে ছাড়ছি না হুজুর। এখনো অনেক বাকি—

লাঠি আর আমি শেখাব না; সবাইকে ভুলে যেতে বলি। যা জানো সে-সমস্তও ভুলে যাবে কিন্তু আমার এখানে এসে থাকলে।

অনেক বারই একথা হইয়াছে, কিন্তু চিন্তামণি একবর্ণ বিশ্বাস করে না। গুণীন লোক সহজে কিছু দিতে চায় না, ইহা সে আবাল্য দেখিয়া আসিতেছে।

অনেক মিথ্যাভাষণ শুনিতে হয়, লাঞ্ছনা সহিতে হয় খাঁটি-বস্তু কিছু আদায় করিতে গেলে। চিন্তামণি বলিল, একলব্য আঙুল কেটে গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন। আপনার যদি ইচ্ছে হয়—গোটা হাতখানা কেটেই আমি না হয় দক্ষিণা দেব। লাঠি তো হাত আমাদের—লাঠি ছেড়ে দেওয়া মানে ডান-হাত কেটে ফেলে দেওয়া। হুকুম করেন তো তা-ও করব।

ষাট বছরের বুড়া ওস্তাদ নূতন পাঠ লইবার জন্য শিবনারায়ণকে গুরুমান্য দিয়া ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। এতকাল সাগরেদি করিয়া কি পাইয়াছে, সে-ই বলিতে পারে। কিন্তু ভরসা তিলমাত্র শিথিল হয় নাই। অমূল্য বিদ্যার ভাণ্ডারী শিবনারায়ণ সদয় একদিন হইবেনই, দেশ-বিদেশে কেউ যাহা জানে না—লাঠির সেই কৌশল তিনি শিখাইয়া দিবেন, চিন্তামণি ধন্য হইয়া যাইবে।

(১১)

পরবর্তী বছর কয়েকের ভিতর কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়া শ্যামগঞ্জ-বরণডাঙার দুই পরিবারের মধ্যে ব্যবধান আরও বাড়িয়া গেল।

হঠাৎ একদিন নরহরি খবর পাইলেন, শিবনারায়ণ মারা গিয়াছেন। শ্যামঠাকুরের বিগ্রহ উদ্ধার করিতে গিয়া অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিলেন, সর্বাঙ্গ জুড়িয়া ঘা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই যে তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন, আর দেখা হয় নাই। অসুখ ইতিমধ্যে মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এত কষ্ট পাইয়া গেছেন—কিন্তু ঘোষ-গিন্নির এমন পরিপাটি বন্দোবস্ত যে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কাকপক্ষীর মুখেও এতটুকু খবর শ্যামগঞ্জের এ-পারে পৌঁছে নাই। মৃত্যুর পরেও নয়। মালঞ্চের কূলে চিতায় যখন আগুন ধরাইয়া দিয়াছে, সেই সময় নরহরি কাহার মুখে যেন কথাটি শুনিলেন—ঘোষ-গিন্নি খবর দেন নাই। এমন সময়ে খবর পাইলেন যে একবার চোখের দেখা দেখিবারও উপায় নাই। বৈষ্ণবের স্ত্রী হইয়াও ঘোষ-গিন্নির চালচলন কঠিনতম শাক্তের মতো। নরহরিও কান পাতিয়া খবরটা লইলেন মাত্র,

জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া দু'টা অতিরিক্ত কথা জানিয়া লইবার আর তাঁর প্রবৃত্তি হইল না।

আবার একদিন নৌকাপথে যাইতে নজর পড়িল, মালঞ্চের কিনারায় বালুচরের উপর যেখানে মাধবদাস বাবাজির সমাধি, তারই চারিপাশে নানা আয়তনের অসংখ্য ঘর উঠিতেছে। নরহরির ঢালিপাড়ার ঠিক উল্টা পারে। চিন্তামণি ইতিমধ্যে ছোটখাটো একটি দল জুটাইয়াছে, তাদের বসতি হইবে নাকি এই জায়গায়। কেন্দ্র-স্থলে নূতন মঠবাড়ি হইবে, শ্যামঠাকুর আর রাধারাণীর প্রতিষ্ঠা হইবে। শিবনারায়ণ মনের যে সাধ পূরণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, সাধ্বী স্ত্রী তাহা সমাধা করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ভাল কথা—কিন্তু আখড়া আগে যে জায়গায় ছিল, সেইখানে হওয়াই তো স্বাভাবিক—এত দূরে নদীর ধারে সরিয়া নূতন করিয়া পত্তন করিবার অর্থ কি? এক হইতে পারে, চিন্তামণি দলবল লইয়া পাহারা দিবে—বাহির হইতে আসিয়া পড়িয়া কেহ যাহাতে আর কখনো অনিষ্ট করিতে না পারে। সৌদামিনী লাঠির জোরে ঠাকুর ও ভক্তদের ঠেকাইবেন—এইখানে তাঁর তফাৎ দেখা যাইতেছে শিবনারায়ণের সঙ্গে।

আর একটা সন্দেহ নরহরির মনে উঠিল। ঐখানে সমারোহে সঙ্কীর্তন চালাইয়া তাঁকে জ্বালাতন করিবার মতলব নাই তো? সঙ্কীর্তন ভাল রকম তোড়জোড় করিয়া শুরু করিলে নরহরির এবার বাড়ি বসিয়াই কানে আসিবে, আন্দাজ হইতেছে। শুনিতে শুনিতে তিনি হয়তো একদিন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবেন, ঢালিরা হয়তো খাল ঝাঁপাইয়া ঢাল-সড়কি লইয়া পড়িবে তাঁর ইঙ্গিত পাইয়া। ঘোষ-গিন্নি সত্য সত্যই একটা হাঙ্গামা বাধাইতে চান নাকি? নরহরি চান না। শিবনারায়ণ নাই, কীর্তিনারায়ণ নাবালক, আর সৌদামিনী যতই দেমাক করিয়া বেড়ান —অবোলা নারী ছাড়া কিছু নন। উপযুক্ত প্রতিপক্ষ বরণডাঙায় কে আছে?

এপারে চিতলমারি ও মালঞ্চের মোহানায় নরহরির ঢালিপাড়া ইতিমধ্যে খুব

জাঁকিয়া উঠিয়াছে। শিবনারায়ণ নাই, বাধা দিবার আর কেহ নাই। এই দিক দিয়া নিরঙ্কুশ হইয়া নরহরি অনেকখানি সোয়াস্তি পাইয়াছেন। দিনের অধিকাংশ সময় তিনি ঢালিপাড়ায় থাকেন। মালঞ্চের উপর—বয়স হইয়াছে বলিয়া এবার নিজে তত বেশি নন—তাঁর ঢালির দল আবার ঘোরাফেরা শুরু করিয়াছে। শিবনারায়ণের খাতিরে এ পথ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ভিতরের আগুন নেভে নাই—আগ্নেয়গিরির মতো প্রচ্ছন্ন ছিল, বাধা-বিমুক্ত হইয়া আবার ভয়ঙ্কর হইয়াছে। এ-অঞ্চলে তাঁকে কেহ আর এখন নরহরি চৌধুরি বলে না, নূতন নামকরণ হইয়াছে বাঘাহরি, সংক্ষেপে বাঘা চৌধুরি।

চৌধুরির ঢালা হুকুম, ঢালিপাড়ায় সম্বৎসরে যত ধান লাগে সমস্ত আসিবে তাঁর সদরবাড়ির গোলা হইতে। আট-দশখানা সাঙড়-বোঝাই ধান আসিয়া খালের মুখে লাগে। দিন পাঁচ-সাত ধরিয়া ধীরে সুস্থে ধামা ভরতি ধান নামানো চলিতে থাকে। ওপারে চিন্তামণির দলবল লুব্ধ চোখে তাই তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে। কোনরূপ গোপন কথাবার্তা রঘুনাথের সঙ্গে হইয়াছে কিনা বলা যায় না—ক্রমশ দেখা গেল, একজন দু-জন করিয়া খাল পার হইয়া এপারে ঘর বাঁধিতেছে। খবর শুনিয়া নরহরির উৎসাহ আরও বাড়িল! আগে ধানের নৌকা আসিত বছরে একবার, এখন যখন-তখন আসিয়া ভিড়িয়া থাকে। ওপার শূন্য হইয়া এপারে ঘরের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল; তিন-চারশ ঘর হইয়া দাঁড়াইল। নরহরি নিজে আসিয়া কোথায় কোন্ নূতন ঘর বাঁধা হইবে তদারক করিয়া যান। অনেকেই আসিল, আসিল না সেই একটা লোক—বুড়ো ওস্তাদ চিন্তামণি। আর আসিল না, নিতান্তই যাদের চিন্তামণিকে ছাড়িয়া আসার উপায় নাই।

মেয়েদের কাজ, ধান ভানিয়া কুটিয়া সিদ্ধ করা। আর ভীমরুলের ডিমের মতো বাঘা চৌধুরির সেই মোটা মোটা রাঙা ভাত খাইয়া জোয়ানগুলার বুকের মধ্যে টগবগ করিয়া রক্ত ফোটে, গাঙের ধারে ধারে তারা হল্লা করিয়া পায়

তারা কষিয়া বেড়ায়, চরের উপর বিশ-পঞ্চাশ জনে কুস্তি লড়ে, ঢাল-সড়কির খেলা করে, হাতের তাক কেমন হইল তাই পরীক্ষা করে কখনো বাদার বুনো-হাঁস কখনো বা বোঝাই নৌকার উপর। লকগেট-ওয়ালা নূতন এক খাল হইবে, তার জন্য জমি জরিপ হইয়া গিয়াছে। খাল কাটা হইয়া গেলে খুব সুবিধা হইবে, কিন্তু আপাতত মালঞ্চ ছাড়া ব্যাপারি-নৌকার আর যাই-বার পথ নাই।···দিব্য দাঁড় ফেলিয়া সারি গাহিতে গাহিতে নৌকা চলিয়াছে, হঠাৎ বোঁও—বোঁও—শব্দে মাঝিমাল্লার উপর পোড়া-মাটির গুলি-বৃষ্টি, আর সঙ্গে সঙ্গে মোহানার দিক দিয়া বিকট অট্টহাসি। অচৈতন্য দেহ গলুই হইতে জলে পড়িয়া টানের মুখে পাক খাইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, অমনি চরের উপর হইতে দশ-বিশ জন ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতরাইয়া খালে খালে নৌকা লইয়া কোথায় যে উড়িয়া চলে, সে নৌকার আর কোন সন্ধান হয় না।

শিবনারায়ণ বলিতেন, দিনকাল বদলাইয়াছে। কিন্তু নরহরি বিগত দিনের মুখে রশি পরাইয়া টানিয়া হিঁচড়াইয়া ফিরাইয়া আনিবেনই। শ্যামশরণের আমল আবার আসিবে।

(১২)

বড় বর্ষা। মালঞ্চ উন্মত্ত ঢেউ ভাঙিতেছে। ঢেউ অবিশ্রান্ত আছড়াইয়া পড়িতেছে বউভাসির চরের নূতন বাঁধে। বাঁধ ঠেকাইয়া রাখা দায়। মাটি কাটিবার লোক ডাকিতে মালাধর গোমস্তা পাইক পাঠাইল। পাইকটি নূতন—অতশত খবর রাখে না। হাঁকাহাঁকি করিয়া একেবারে নরহরির ঢালিপাড়ায় গিয়া উঠিল।

মাটি কাটতে পারিস ?

জবাব পাওয়া গেল, না—গলা কাটতে পারি। এবং প্রমাণস্বরূপ একজনে আসিয়া সত্যসত্যই পাইকের গলা চাপিয়া ধরিল।

বাঁচাইয়া দিল রঘুনাথ। কোন্ দিকে যাইতেছিল, হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল।

করিস কি? করিস কি ভানুচাঁদ? চকের মালিক চৌধুরি মশায়ের কুটুম্ব হন যে! বিদেশি পাইক—ইনি হলেন আমাদের অতিথ।

ভানুচাঁদ তখন গলা ছাড়িয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, কুটুম্বর লোকের সঙ্গে ঠাট্টা করলাম একটু—

বিনয়ে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া রঘুনাথ করজোড়ে জিজ্ঞাসা করিল, কি আজ্ঞে হয় পাইক মশায়?

কাঁপিতে কাঁপিতে পাইক মহাশয় তখন কোন গতিকে বক্তব্য শেষ করিল। রঘুনাথ সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝাইয়া দিল, আমরা মাটি কাটি নে। বাঘা চৌধুরির ধান আসে—ডাক পড়লে খাজনা দিতে যাই। আমরা ঢালি—মুটে ঐ ওপারের ওরা।

ভ্রূ কুঁচকাইয়া ব্যঙ্গের সুরে বলিতে লাগিল, পেটের দায়ে ওরা মোট বয়, মাটি কাটে, কত কি করে। আপনি ভুল করে এ পাড়ায় এসেছেন, পাইক মশায়।

বলিয়া সগর্ব হাসিয়া রঘুনাথ ওপারের চিন্তামণির দলবল দেখাইয়া দিল।

ওপারের লোক খবর পাইয়া মাটি কাটিতে আসিল। উহারা যখন ঘামে-মাটিতে ভূত সাজিয়া কোদাল পাড়িতে থাকে, তখন রঘুনাথের দল তৈল-চিক্কণ চুলে দিব্য টেরি কাটিয়া শিস দিতে দিতে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। কাজের শেষে শ্রান্ত পায়ে ওপারের দল ফিরিয়া যায়, ঘরে ঘরে ঢোল পিটাইয়া এপারে তখন সঙ্গীত শুরু হইয়াছে।

পাইকের কাছে রঘুনাথের সগর্ব উক্তিটা ক্রমশ মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িল। শেষে সৌদামিনীরও কানে পৌঁছিল। চিন্তামণিকে ডাকিয়া আনিয়া তিনি বলিলেন, আমার গোলা-ভরা ধান নেই ওস্তাদ, কিন্তু ভক্তদের জন্য কর্তা ঐ অতিথশালা গড়েছিলেন। আমার বাপধনেরা সব ঐখানে এসে থাক। শাক-ভাত একসঙ্গে সকলে ভাগ করে খাওয়া যাবে। -

ইহার উপর আর কথা নাই। চিন্তামণি ছোটদলটি লইয়া ঘোষ-বাড়িতে

উঠিল। ওপার একেবারে উৎখাত হইয়া গেল। ঢালি বলিতে যা রহিল সমস্ত নরহরির। বাঘা চৌধুরি মালঞ্চের একেশ্বর হইয়া পড়িলেন। সে এমন হইয়া উঠিল, দেশ-বিদেশের ব্যাপারিরা যাইবার মুখে ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া ভক্তিভরে মোহর দিয়া চৌধুরি মহাশয়কে প্রণাম করিয়া যায়। বাঘাহরির নামে সরকারি খেয়াতেও পয়সা লাগে না। একবার একটা পশ্চিমি লোক কোন একটা পার-ঘাটের ইজারা লয়। চৌধুরিবাবুদের মাহাত্ম্য তার কানে গিয়াছিল। কিন্তু একদিন আধময়লা কাপড়-পরা এক ছোকরা পারানি পয়সা না দিয়া বিনাবাক্যে চলিয়া যায় দেখিয়া প্রতিবাদ করিয়া তাকে বলিল, সবাই মিলে নরহরি চৌধুরির দোহাই পাড়লে আমার কি করে চলে বাপু? ফিরবার সময় লিখন নিয়ে এসো, নইলে পয়সা লাগবে।

ছোকরা মুখ ফিরাইয়া কহিল, লিখন সঙ্গেই আছে চাঁদ আমার। এবং বাঁ-হাতখানা মাঝির গলায় তুলিয়া অবলীলাক্রমে তাকে জলের মধ্যে গোটা দুই-তিন চুবানি দিয়া হাসিয়া দু-হাত সামনে প্রসারিত করিয়া বলিল, একটা কেন—আমার এই দু-দুটো লিখন।

তারপর আপন মনে শিস দিতে দিতে সে চলিয়া গেল।

পর দিন দেখা গেল, খেয়ার ঘাটে নৌকা নাই। দু-তিন শ টাকা দামের নৌকা, বিস্তর চেষ্টা-চরিত্র করিয়াও কোন সন্ধান হইল না। সরকারি খেয়া বন্ধ রাখা চলে না, যে করিয়া হোক আবার নৌকার জোগাড় করিতে হইল। তার পরের দিন রাত্রে সেখানিও নিখোঁজ। তখন সেখানকারই একজন বাসিন্দা সৎবুদ্ধি বাৎলাইয়া দিল, ঢালি-পাড়ায় যাও গো মাঝি। সেদিন যে-লোকের কাছে পয়সা চেয়েছিলে সে হল ভানুচাঁদ—বাঘাহরির বাছা খেলোয়াড়।

মাঝি তখন ভানুচাঁদের খোঁজ করিয়া হাতে-পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। ভানু বলিল, আমি কি জানি? যা বলবার বল গিয়ে সর্দারের কাছে। আমাদের বাপু হাত-পা-ই খোলা আছে—মুখ বন্ধ।

বস্তুত অনেক করিয়াও ইহার বেশি আর কিছু বাহির হইল না। যত জিজ্ঞাসা করে, হাসিয়া কেবল শিস দেয়, আর বুড়া-আঙুল নাড়িয়া নাড়িয়া গান করে, জানি নে—জানি নে—

তখন মাঝি রঘুনাথের কাছে গিয়া পড়িল।

নিতান্ত ভালমানুষ রঘুনাথ, যত্ন করিয়া শীতলপাটি পাতিয়া বসাইল, তামাক খাইতে দিল। কিন্তু আসল কথা উঠিলে সে-ও একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। অত্যন্ত দরদ দেখাইয়া কহিল, আ-হা-হা—দু-দু'খানা নৌকো। কেন, নোঙর করা ছিল না ?

মাঝি বলিল, মোটা কাছিতে নোঙর তো ছিলই, অধিকন্তু লোহার শিকলে চাবি-আঁটা। আর তারাও পালা করিয়া দাওয়ায় সজাগ হইয়া ছিল। কিন্তু কিছুতে কিছু হইল না; অত বড় নোঙরটা উঠিল, চাবি ভাঙিল,—কিন্তু এতটুকু শব্দ নাই, জলের উপর সামান্য ছপছপানিও নয়, যেন মন্ত্রবলে কাজ হইয়া গেল।

রঘুনাথ হাসিয়া ফেলিল। বলিল, হয়—অমন হয়ে থাকে, মাঝি ভাই। জোয়ারের টানে হয়তো ভেসে গেছে কোন মুল্লুকে—

মাঝি খপ করিয়া তার পা জড়াইয়া ধরিল।

কোন মুল্লুকে ভেসে গেছে, সেইটে বলে দিতে হবে, সর্দার।

এবারে রঘুনাথ রীতিমতো রাগিয়া একটানে পা ছাড়াইয়া লইল। বলিল, আচ্ছা আহম্মক তো তুই। মুল্লুকের মালিক চৌধুরি মশায়। বলেন যদি—তিনি বলতে পারেন। আমরা নুন খাই, ডাক পড়লে খাজনা দিয়ে আসি—এই কেবল সম্পর্ক। আমরা কে ?

অতএব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আবার সেই নরহরি চৌধুরি পর্যন্ত ধাওয়া করিতে হইল। বয়সের সঙ্গে নরহরির রসিকতা বাড়িয়া গিয়াছে। নজর দিয়া পদপ্রান্তে হাতজোড় করিয়া বসিতে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

ওকি হল? না না—উঠে বোসো, টাকাটা তুলে নাও। তুমি হলে কোম্পানির খেয়ার ইজারাদার—

কোম্পানির ইজারাদার নাক-কান মলিয়া বলিল, আর ঘাট হবে না চৌধুরি মশায়! আমি পারানির এক-শ গুণ ধরে দিচ্ছি।

নরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পারানি কত?

দু-পয়সা।

নরহরি হিসাব করিয়া কহিলেন, অর্থাৎ আরো টাকা দুই আন্দাজ দিচ্ছ তুমি। আর তোমার নৌকো দু-খানার দাম?

সাড়ে তিন-শ, চার-শ—

নরহরি নরম স্বরে কহিলেন, আমারও হ্যাঙ্গাম আছে বাপু, লোকজন লাগিয়ে দেশদেশান্তর খুঁজতে হবে। তা যাকগে, তুমি একখানারই দাম ধরে দিও। কোম্পানির ইজারাদার—যা হোক একটা খাতির-উপরোধ আছে তো!

অবশেষে একপক্ষের কান্নাকাটি অপর পক্ষের খাতির-উপরোধের ফলে এক শ টাকায় রফা হইয়া দাঁড়াইল।

নরহরি বলিলেন, টাকাটা কি নিয়ে এসেছ বাপু?

খেয়ার ঘাট বন্ধ রাখিবার জো নাই, বড় মুশকিল হইয়াছে। মাঝি তাড়াতাড়ি বলিল, আমি কালই দিয়ে যাব—নিশ্চয়—

আমিও খোঁজ-খবর করে রাখব। বলিয়া এক মূহূর্ত লোকটার কাতর মুখে তাকাইয়া নরহরির সত্য সত্যই করুণা হইল। আর দেশদেশান্তর খোঁজের অপেক্ষা না রাখিয়া বোধ করি যোগ-প্রভাবেই বলিয়া দিলেন, চিতলমারির খালে দেড় বাঁক গিয়ে যে বড় কেওড়াগাছটা—তারই কাছে জলের তলায় খোঁজ করে দেখো। দু-খানা নৌকো এক জায়গায় আছে। যাও। আর টাকাটা কালই দিয়ে যেও—নয়তো, বুঝলে তো?

বলিয়া চৌধুরি মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন।

মাঝি কৃতজ্ঞ অন্তরে চলিয়া গেল। সবই সে উত্তম রূপে বুঝিয়াছিল।

পরদিন কি একটা কাজে রঘুনাথ আসিয়াছিল। হাসিমুখে নরহরি কহিলেন, টাকা নেবে সর্দার? মাঝি বেটা শোধ করে দিয়ে গেছে। নিয়ে যাও না গোটাকতক।

রঘুনাথ ঘাড় নাড়িল।

চৌধুরি তবু বলিলেন, তুমি না নেও—ভানুচাঁদ আছে, আরও ছোকরারা আছে। কীর্তি তো ওদেরই। নিয়ে যাও, আমোদ-আহ্লাদ করবে।

হাসিয়া রঘুনাথ বলিল, ভানু কি আর আলাদা একটা-কিছু বলবে? দলের লোক না? ও বড্ড ঝঞ্ঝাট চৌধুরি মশায়। টাকা নেও—হাটে-ঘাটে যাও—দরদস্তুর কর। অত ঘোরপ্যাঁচ পোষায় না আমাদের। আমরা সোজা মানুষ, সম্বৎসর খাওয়াচ্ছ তুমি—হুকুম হলে খাজনা দিয়ে যাব। ব্যস।

টাকা লইল না; প্রণাম করিয়া সে লাঠি তুলিয়া লইয়া রওনা হইল।

(১৩)

অগ্রহায়ণ মাস। বউভাসির চকের ধান কতক কাটা-ঝাড়া হইয়াছে। কিন্তু দর কম বলিয়া আদায়পত্র বড় মন্দা। আবার যা আদায় হয়, বাঁধ-মেরামতে ও আর দশটা বাবদে চলিয়া যায় তার অর্ধেকের বেশি। এবারে তহ্‌শিল করিতে সদর-নায়েব হরিচরণ চাটুজ্জে মহাশয় স্বয়ং বরিশাল হইতে চলিয়া আসিতেছেন। চিঠি আসিয়াছে, তিনি রওনা হইয়া গিয়াছেন; আরও তিন-চারটা মহাল পরিদর্শন করিয়া তারপর এখানে আসিয়া পৌছিবেন। দু'টা জেলা পার হইয়া এতদূর অবধিও হরিচরণের নামডাক। মালাধর কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

যথাকালে সদর-নায়েব আসিলেন। মালাধরের চণ্ডীমণ্ডপে মহাসমরোহে কাছারি চলিতেছে। আহারাদির ব্যবস্থা মালাধরের বাড়িতে। মালাধর

যেন রাজসূয় ব্যাপার লাগাইয়াছে। গোটা জেলার মধ্যে কইমাছ যত মোটা হইতে পারে, তারই বিপুল সংগ্রহ কলসি-ভরতি করিয়া জিয়াইয়া রাখা। ঘরকয়েক গোয়ালা প্রজা আছে, তারা সকাল-সন্ধ্যা দুধ-ঘি নিয়মিত যোগান দিয়া চলিয়াছে। ক্রমশ গঞ্জের দোকানের সন্দেশ-রসগোল্লাও দেখা দিতে লাগিল। আয়োজন পরম সুন্দর। হরিচরণ মাঝে মাঝে ভদ্রতা করিয়া অনুযোগ করেন, কি শুরু করলে বল দিকি সেন মশাই? এত কি দরকার?

বিনয়ে গলিয়া গিয়া মালাধর বলে, আজ্ঞে না। এ কি আপনার যুগ্যি? ছাই-ভস্ম—যা হোক মোটের উপর দু'টি পেট ভরে সেবা করেন।

সেবা আকণ্ঠ পুরিয়াই চলিতে লাগিল। কিন্তু বিকালে জমাখরচ মিলাইবার সময় সমস্তই বোধকরি একদম হজম হইয়া যায়।

এ যে ভয়ানক কাণ্ড, একেবারে পুকুর-চুরি! পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হরিচরণ চমকিয়া ওঠেন। চার মজুরে তিন পয়সার তামাক পুড়িয়ে ফেলল? এ কক্ষণো হতে পারে না সেন মশাই।

মালাধর বিরক্ত হইয়া ওঠে। উত্তর দেয়, হয় মশাই, হিসেব করে দেখুনগে—চার জন কেন, এক একজনেই যে পাহাড় উড়িয়ে দিতে পারে।

একদিন সকালবেলা হরিচরণ নিজে বাঁধ দেখিতে গেলেন। আশ্চর্য কাণ্ড, শ পাঁচেক টাকার মাটি কাটা হইয়াছে, কড়াক্রান্তি অবধি হিসাব করিয়া দেখানো হইয়াছে, অথচ বাঁধের কোনোদিকে মাটি কাটার চিহ্ন নাই একটু।

মালাধর বলিল, গর্ত থাকবে কি মশাই, আট-ন মাস হয়ে গেল—জোয়ার-জলে সমস্তই তো ভরাট করে দিয়ে গেছে।

আর তোলা-মাটি বুঝি বৃষ্টির জলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে?

যে আজ্ঞে। বলিয়া মালাধর সপ্রতিভ হাসি হাসিল।

শোন সেন মশাই—হরিচরণ হাসিলেন না, রূঢ় কণ্ঠে কহিলেন, বাঁধ মেরামত বন্ধ আজকে থেকে। ভবিষ্যতে বিশেষ হুকুম না নিয়ে কাজে নামবেন না।

তা হলে চকে লোনা জল ঢুকবে—

হরিচরণ বলিলেন, কিন্তু তা না হলে যে গোটা চকসুদ্ধ তোমার ট্যাঁকে ঢুকে যাবে।

মালাধর চুপ করিয়া গেল।

একদিন যথারীতি কাছারি চলিয়াছে, এমন সময় হুম-হাম করিয়া নরহরি চৌধুরির হাঙরমুখো পালকি উঠানে আসিয়া নামিল। যে যেখানে ছিল, তটস্থ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নরহরি হাসিমুখে সকলের দিকে একবার তাকাইলেন। তারপর হরিচরণকে বলিলেন, গিন্নির বার্ষিক শ্রাদ্ধ। কয়েকটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের বাসনা হয়েছে। দয়া করে দুপুরবেলা একটু পদধূলি দেবেন নায়েব মশাই।

কাজকর্মের তাড়া আছে জানাইয়া চৌধুরি আর বসিলেন না, সরাসরি আবার পালকিতে গিয়া বসিলেন।

সেবারের সেই পাইকটি উপস্থিত ছিল, নিশ্বাস ফেলিয়া যেন হরিচরণেরই মনের কথাটা প্রকাশ করিয়া কহিল, সর্বরক্ষে!

দাখিলা লিখিতে লিখিতে বাঁকাহাসি হাসিয়া মালাধর বলিল, তাই কি বলা যায় রে ভাই?

উপস্থিত প্রজাপাটক সকলেই হাসিতে লাগিল। মালাধর বলিতে লাগিল, হাসির কথা নয় রে, দাদা। পুরাণে পড়েছ, ভগবানের দশ অবতার। তার ন'টা হয়ে গেছে—শেষ নম্বর ঐ উনি। আস্ত কলিঠাকুর। মাটি দিয়ে ছাঁচ তুলে রাখা উচিত।

দাখিলার বইটা হরিচরণের দিকে সহির জন্য আগাইয়া দিয়া মালাধর

টাকাকড়ি বাজাইয়া গণিয়া হাতবাক্সে তুলিল। তারপর নায়েবকে লক্ষ্য করিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল, বিদেশি মানুষ, ভাল করে চেনেন না তাই। বরকন্দাজ না পাঠিয়ে স্বয়ং সশরীরে ঐ যে আদর-আপ্যায়ন করে গেলেন—আমার কিন্তু সেই অবধি মোটে ভাল ঠেকছে না মশাই।

হয়েছে, হয়েছে—চুপ কর দিকি! হরিচরণ সগর্বে বলিতে লাগিলেন, নিজে আসবেন না কি! আমাদের বাবু যে চৌধুরি মশায়ের পিশতুত ভায়রা। খবর রাখ?

ভায়রার নিমন্ত্রণে যে প্রকার উল্লাস হইবার কথা, মুখভাবে অবশ্য তাহার একটুও প্রকাশ পাইল না। কিন্তু একঘর লোকের সামনে আলোচনা আর অধিক বাঞ্ছনীয় নয়। থামিতে গিয়াও তবু মালাধর বলিয়া উঠিল, ব্রাহ্মণ-সন্তান—বিদেশে এসেছেন। খেয়ে-দেয়ে এখন সুভালাভালি ফিরে আসুনগে। আমাদের আর কারও কিন্তু নেমন্তন্ন হয় নি—শুধু আপনার—

দুর্গানাম স্মরণ করিয়া হরিচরণ নিমন্ত্রণে চলিলেন।

হেলিতে দুলিতে হরিচরণ ফিরিয়া আসিলেন। দেখা গেল, আশঙ্কা অমূলক; দিব্য হাসিমুখে তিনি পান চিবাইতেছেন। হাসিয়া বলিলেন, বিদেশি লোক বলে খামকা একটা ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলে সেন মশায়?

মালাধর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

হরিচরণ বলিলেন, অতি মহাশয় ব্যক্তি। নরহরি চৌধুরির নাম-ডাকই শুনে আসছি, পরিচয় তো তেমন ছিল না। দেখলাম—হাঁ, মানুষ বটে একটা!

মালাধর সশঙ্কে জিজ্ঞাসা করিল, বৃত্তান্ত কি নায়েব মশায়?

গর্বিত সুরে নায়েব বলিলেন, চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়—আর কিছু নয়।

মালাধর গম্ভীর হইয়া ঘাড় নাড়িতে লাগিল। বলিল, কি জানি! শনির নজর পড়লে গণেশের মুণ্ডু উড়ে যায়, এই তো এতকাল জানা ছিল—

সত্যই, বিস্ময়ের পারাপার নাই।

দিনকয়েক পরে পুনরায় হাঙরমুখো পালকি এবং পুনশ্চ নিমন্ত্রণ। এবারে নরহরির মেয়ে স্বর্ণলতার পুতুলের বিয়ে না অমনি কি একটা ব্যাপার। তারপর যাতায়াত শুরু হইল প্রায় প্রতিদিনই; উপলক্ষের আর বাছবিচার রহিল না। এদিকে বরিশালে জমিদারের নামে হরিচরণ মোটা মোটা লেপাফা পাঠাইতেছেন। মালাধর দাখিলা লেখে আর আড়চোখে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে। শেষে একদিন মরীয়া হইয়া বলিয়া বসিল, কথাটা একটু ভাঙুন দিকি নায়েব মশায়—

কি ?

আজ্ঞে, আমরাও ছিটেফোঁটার প্রত্যাশী।

না—না—সে সব কিছু নয়।

হরিচরণ তখনকার মতো চাপা দিলেন বটে, কিন্তু মালাধর ছাড়িবার লোক নয়। অতঃপর প্রায়ই কথাটা উঠিতে লাগিল। একদিন শেষে চুপিচুপি নায়েব বলিলেন, বউভাসির চক বাবুরা ছেড়ে দিচ্ছেন।

মৃদু হাসিয়া মালাধর বলিল, নিচ্ছেন নরহরি চৌধুরি—

বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া হরিচরণ প্রশ্ন করিলেন, কোথায় খবর পেলে? তুমি জানলে কি করে?

মালাধর বলিতে লাগিল, আর কার মাথা-ব্যথা পড়েছে বলুন? কত চেষ্টা হয়েছে এর আগে! চকের দক্ষিণে চৌধুরির ঢালিপাড়া, গরজ চৌধুরির নয় তো কি আর গরজ হবে বরণডাঙাদের?

তারপর জিজ্ঞাসা করিল, দরদস্তুর হয়ে গেছে নাকি?

হরিচরণ বলিলেন, তা একরকম। তিন-চার শ'র এদিক-ওদিক আছে, হয়ে যাবে বই কি!

আজ্ঞে, সে দরের কথা বলছি না। একটু হাসিয়া চোখ টিপিয়া মালাধর বলিল, বলি গণেশ-পূজোর ব্যবস্থাটা হল কি রকম?

হরিচরণ বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া চাহিলেন।

হাসিতে হাসিতে মালাধর বলিল, ব্রাহ্মণ-সন্তান—শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি আপনি। ঐ দুর্গা বলুন, কালী বলুন—সকল বড়-পূজোর আগে গণেশ পূজো। বাচ্চাঠাকুর আগে খুশি হবেন, তবে বড়দের ভোগে আসবে। আট-টাকা মাইনে পাই মশাই, তা-ও তিন বচ্ছর বাকি। এই হাতবাক্স কোলে করে সেরেস্তায় বসে আছি, সত্যি সত্যি তো যোগ-তপস্যা করতে আসি নি।

শিহরিয়া নায়েব জিভ কাটিলেন, ঘুস?

আজ্ঞে না, পাওনা-গণ্ডা—

হরিচরণ গম্ভীর মুখে বলিলেন, তোমার চাকরি বজায় থাকে, চৌধুরি মশায়কে সেই অনুরোধ করতে পারি। তার বেশি এককড়াও নয়।

চক বন্দোবস্তের সমস্ত ঠিকঠাক দিনস্থির পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে, হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো বরিশাল হইতে হুকুম আসিল, চক আপাতত বিক্রয় হইবে না—কবলাপত্র স্থগিত থাকুক।

মালাধরই পত্রের মর্ম পড়িয়া শুনাইল। রুক্ষ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া হরিচরণ প্রশ্ন করিলেন, কাণ্ডটা কি?

মালাধর যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে। বলিল, আপনাদের বড় বড় ব্যাপার, আমি কি জানি মশাই? আমি দাখলে লিখি, মেলা দেখে বেড়াই, ব্যস—

হুঁ—বলিয়া নায়েব গুম হইয়া রহিলেন। সেই বিকালটায় আপাতত চৌধুরি-বাড়ির খবরাখবর লওয়া বন্ধ রাখিতে হইল, ভাবিয়া চিন্তিয়া মনের মধ্যে

যা হোক কিছু খাড়া না করিয়া যাওয়া ঠিক নয়। সকালবেলা কাছারির দোর খুলিয়াই দেখা গেল সামনে রঘুনাথ। সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করিল, শরীর গতিক ভাল তো? চৌধুরি মশায় উতলা হয়েছেন।

মালাধরও সবে ঘুম ভাঙিয়া কৃষ্ণের শতনাম আওড়াইতে আওড়াইতে বাহিরের দিকে আসিতেছিল, গলা খাটো করিয়া বোধকরি বাতাসকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিল, কুটুম্বিতে একে বলে। একটা দিন দেখেন নি, দুশ্চিন্তায় চৌধুরি মশায় একেবারে একপ্রহর রাত থাকতে লোক মোতায়েন করে দিয়েছেন।

রঘুনাথ কাপড়ের খুঁট হইতে চিঠি বাহির করিয়া দিল। সেই পুরাণো ব্যাপার—মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ। আর একদফা পদধূলি লইয়া রঘুনাথ বিদায় হইয়া গেল।

কাছারি বসিয়াছে। মালাধর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটা হিসাব মিলাইতেছে। মাঝে মাঝে আড়চোখে হরিচরণের দিকে তাকাইয়া দেখে। এতদিনের মধ্যে যা কখনো হয় নাই—এদিক-ওদিক তাকাইয়া হঠাৎ নায়েব বলিয়া উঠিলেন, একটা সৎযুক্তি দাও তো সেন মশাই—

মালাধর ঘাড় তুলিল না। তেমনি হিসাব করিতে করিতে বলিল, আজ্ঞে?

হরিচরণ বলিলেন, চৌধুরি মশায় নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছেন, কিন্তু শরীরটে বড় খারাপ লাগছে—

আজ্ঞে—বলিয়া মালাধর এবার আপন মনে দুর্গানাম লিখিতে লাগিল।

হরিচরণ রাগ করিয়া খাতাপত্র ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, কথাটা যে মোটে কানে নিচ্ছ না?

মালাধর সন্ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে, অসুখ করেছে নিশ্চয়—নয় তো শরীর খারাপ লাগবে কেন?

নায়েব আরও রাগিয়া বলিলেন, তোমায় সেজন্য পাঁচন জ্বালাতে বলছি না সেন মশাই। জিজ্ঞাসা করছি, চৌধুরির নেমন্তন্নের কি হবে?

যেতে হবে।

অসুখ অবস্থায় ?

আজ্ঞে, বাঘাহরির ব্রাহ্মণভোজনের ইচ্ছে হয়েছে যে !

নায়েব বলিলেন, চিঠি লিখে পাইক পাঠিয়ে দেওয়া যাক। নয় তো ভদ্রলোক অনর্থক যোগাড়-যন্ত্র করে বসে থাকবেন—

মালাধার এদিক-ওদিক বার দুই ঘাড় নাড়িয়া সংশয়ের স্বরে বলিল, আস্তা-কুড়ে গিয়ে বসলে কি যমে ছাড়বে মশাই ? বিশ্বাস তো হয় না। তবে আপনাদের কুটুম্বিতের ব্যাপার—এই যা।

যা বলিল তাই। চিঠি লিখিয়া পাইক পাঠানো হইল। কিন্তু নিমন্ত্রণ মাপ হইল না। যথাকালে একেবারে পালকি-বেহারা চলিয়া আসিল। সঙ্গে রঘুনাথ।

হরিচরণ বলিলেন, জ্বর হয়েছে।

রঘুনাথ হাসিয়া বলিল, তাইতো চৌধুরি মশায় ব্যস্ত হয়ে পালকি পাঠালেন। মাটিতে সে হাতের পাঁচ-হাতি লাঠিখানা একবার অকারণে ঠুকিল। পিতলের আংটা ঝুন-ঝুন করিয়া বাজিয়া উঠিল।

মালাধর চোখের ইসারায় নায়েবকে ডাকিয়া লইয়া কহিল, বেলা করবেন না, উঠে পড়ুন পালকিতে।

নায়েব বিস্মিতভাবে চাহিলেন। মালাধর বলিতে লাগিল, দেব-দ্বিজে ওঁর অচলা ভক্তি। নেমন্তন্ন ওরা আজ খাওয়াবেই ঠেকছে। একবার বলরাম স্মৃতিরত্নকে পিছমোড়া বেঁধে নেমন্তন্ন খাইয়ে দিয়েছিল।

সাত-পাঁচ ভাবিয়া হরিচরণ পালকিতে উঠিলেন। নামিয়া নরহরির বৈঠক খানায় ঢুকিয়া দেখেন, গম্ভীর মুখে চৌধুরি পায়চারি করিতেছেন। বরিশালের চিঠিটা হাতে দিয়া হরিচরণ বলিলেন, কিসে কি হল, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না হুজুর। আমার এক বিন্দু গাফিলতি নেই।

পড়া শেষ করিয়া নরহরি ডাকিলেন, রঘু !

হরিচরণ বলিতে লাগিলেন, ঐ মালাধর বেটার হয়তো কোনরকম কারসাজি আছে। ওটাকে সায়েস্তা করা দরকার।

নরহরি আরও গম্ভীর উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, রঘুনাথ!

হরিচরণ ছুটিয়া গিয়া রঘুনাথকে ডাকিয়া আনিলেন।

নরহরি বলিলেন, এঁকে খাবার জায়গায় বসিয়ে দিয়ে এসো।

হরিচরণ তাড়াতাড়ি বলিলেন, কথাটা তা হলে খাবার পরই হবে হুজুর—

নরহরি পুনশ্চ রঘুনাথকে বলিলেন, খাওয়া হলে দেউড়ি পার করে আসবে, বুঝলে?

রঘুনাথ বিশেষ সম্বর্ধনা করিয়া কহিল, আসতে আজ্ঞা হয় নায়েব মশায়।

(১৫)

আবছা জ্যোৎস্নায় প্রহরখানেক রাত্রে ঢালিপাড়ার ঘাটে ছোট একখানা ডিঙি আসিয়া লাগিল। এবারে বোঝাই হইয়া আসিয়াছে ধান নয়—কোদাল। রঘুনাথ সর্দার ডিঙি হইতে নামিয়া গিয়া ভানুচাঁদকে ডাকিল। বলিল, চটপট ঐগুলো বিলি করে দে তো বাবা।

ভানুচাঁদ আশ্চর্য হইয়া বলিল, শেষকালে চৌধুরি মশায় কোদাল পাঠালেন সর্দার?

সর্দার বলিল, নিয়ে এলাম। দীঘি কাটার চার-পাঁচশ' কোদাল পড়ে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। ভানুর অপ্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া রঘুনাথ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। যে রকম ঘোরপ্যাঁচ কোম্পানির আইন—লাঠি-কোদাল দুই-ই রাখতে হয় রে—কখন কোনটা লাগে। চৌধুরি মশায় তাই বললেন—নিয়ে যাও সর্দার।

চকের ধান এখনো আধাআধি আন্দাজ কাটিতে বাকি। এখানে-ওখানে খামার করিয়া গাদা দেওয়া হইয়াছে। দিন তিনেক পরে মহা এক বিপর্যয় কাণ্ড

হইয়া গেল। মালাধরের উত্তরের ঘরে হরিচরণ ঘুমাইয়া ছিলেন। অনেক রাত্রি। হঠাৎ বহুলোকের চিৎকারে ঘুম ভাঙিয়া নায়েব বাহিরে আসিলেন। চাঁদ অস্ত গিয়াছে। বিশ-ত্রিশজন চাষী বুক চাপড়াইয়া মাথা কুটিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল। তাদের সর্বনাশ হইয়া যায়! বাঁধ ভাঙিয়াছে, নদীর নোনা জল পাকাধান ডুবাইয়া নষ্ট করিয়া তাদের সম্বৎসরের আশা-ভরসা ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে।

চোখ মুছিতে মুছিতে মালাধরও আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পর সেই ক্রোশখানেক পথ সকলে একরকম দৌড়িয়া চলিয়া গেল। শেষরাত্রির অন্ধকার-নিমগ্ন মালঞ্চ। কোটালের মুখ; জোয়ার নামিয়াছে। শীতের শীর্ণ নিস্তেজ মালঞ্চ জলতরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। কলকল করিয়া নোনা জল বিপুল বেগে চকের নয়ানজুলি বোঝাই করিয়া ফেলিতেছে। আট-দশ হাত ভাঙন দেখিতে দেখিতে বিশ হাত হইয়া দাঁড়াইল। বিপুল সর্বনাশের সম্মুখে হতভম্ব হরিচরণ ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। চাষীরা উন্মাদের মতো হইয়া গিয়া ঝাপ দিয়া সেই জলস্রোতের মধ্যে গিয়া পড়িল, যেন বুক দিয়া ঠেকাইতে চায়। পারিবে কেন? জল ধাক্কা দিয়া তাদের ফেলাইয়া দেয়, পড়িয়া গড়াইতে গড়াইতে রক্তাক্ত ক্ষত দেহে কোনগতিকে উঠিয়া আবার জল ঠেকাইবার চেষ্টায় বৃথা আকুলি-বিকুলি করে।

মালাধর চেঁচাইতে লাগিল, উঠে আয় বেটারা। গ্রামে গিয়ে বাঁশ কেটে নিয়ে আয় আমার ঝাড় থেকে। কান্নায় কি আর জল ঠেকাবে?

বাঁশ আসিয়া পৌঁছিল। পঞ্চাশ-ষাটটা বাঁশের খোঁটা জলের মধ্যে পুতিয়া গোছা গোছা কাটা-ধান আনিয়া তার গায়ে দিতে অনেক কষ্টে জলের বেগ কমিল। রাত্রি শেষ হইয়া পূর্বাকাশে রক্ত আভা দেখা দিয়াছে। জল-কাদা মাখিয়া চাষীদের সঙ্গে মালাধরেরও অদ্ভুত মূর্তি হইয়াছে। তারপর নদীতে ভাঁটা পড়িয়া গেলে ঝপাঝপ মাটি কাটিয়া বাঁধ মেরামত হইল।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে হরিচরণ বলিয়া উঠিলেন, এ চৌধুরির কাজ, আমি হলপ করে বলতে পারি।

চুপ, চুপ! মৃদু হাসিয়া মালাধর কহিল, রাগ চেঁচিয়ে করবেন না—মনে মনে করুন। চৌধুরির দু-শ লাঠি আর চার-শ কান।

একটু থামিয়া বলিল, আমি মশাই রাতদিন মাথা কুটে মরছি, নিদেন পক্ষে গাঙের দিক্‌কার বাঁধটা জব্দ রাখুন। আপনি গেলেন সরকারি পয়সা বাঁচাতে। কোটালের টান—পুরাণো বাঁধ রাখতে পারবে কেন? এখন চৌধুরির দোষ দিচ্ছেন। বাবু কি আর বিশ্বাস করবেন কুটুম্বর দোষ?

আলবৎ! হরিচরণ রাগিয়া আগুন। বলিতে লাগিলেন, এই কাজে চুল পাকিয়ে ফেললাম সেন মশাই, কোনটা কোটালের ভাঙন আর কোনটা মানুষের কাটা—তুমি আমায় শেখাতে এসেছ? বাবুকে আজই চিঠি লিখছি, বুঝুন তাঁর কুটুম্বর কাণ্ডটা।

নায়েব চিঠি লিখিলেন। মালাধরও বাড়ির মধ্যে গিয়া বিস্তর মুশাবিদা করিয়া গোপনে আর এক সুদীর্ঘ চিঠি লিখিল। সদর হইতে জবাব আসিল হরিচরণের নামে, কি আসিল তিনি কাহাকেও দেখাইলেন না। ক'দিন পরে তল্পিতল্পা বাঁধিয়া বিদায় হইয়া গেলেন। মনের আনন্দে মালাধর হরির লুঠের জোগাড় করিল।

অতঃপর মালাধর একেশ্বর। বাঁধ-মেরামতে আর কৃপণতা নাই। কিন্তু বাঁধ ভাঙা বন্ধ হইল না। ধান কাটা শেষ হইয়াছে, কাজেই আশু ক্ষতি গুরুতর হইতেছে না। কিন্তু নদী যেন মানুষের সঙ্গে দুষ্টামি লাগাইয়াছে। মালাধর লোকজন ডাকিয়া সমস্তদিন হৈ-হৈ করিয়া নূতন মাটি ফেলিয়া আসে—সকালে গিয়া দেখা যায়, মালঞ্চ পাশে আর এক জায়গায় মাথা ঢুকাইয়াছে। আর মজা এই, নদীর যত আক্রোশ ঐ রাত্রিবেলাতেই। বিশেষত কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি হইলে তো কথাই নাই।

একদিন অমাবস্যার কাছাকাছি কি একটা তিথি, সমস্তটা দিন মেঘলা করিয়া সন্ধ্যার পরে টিপিটিপি অকালবর্ষা শুরু হইল। খানিক রাত্রে একখানা বাঁশের লাঠি হাতে লইয়া মালাধর একাকী বাঁধের আড়ালে গুটিসুটি হইয়া বসিল। তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিসারিত করিয়া সে গাঙের দিকে তাকাইয়া রহিল। আন্দাজ ঠিকই—অনেকক্ষণ তাকাইয়া তাকাইয়া তারপর দেখিল, কুল ঘেঁসিয়া উজান ঠেলিয়া কালো রেখার মতো ছোট একটা ডিঙি আসিতেছে। বিশ-পঁচিশটা মরদ একহাতে কোদাল আর একহাতে সড়কি—ডিঙি হইতে নামিয়া ঝপাঝপ বাঁধে কোদাল মারিতে লাগিল। পা টিপিয়া টিপিয়া মালাধর নদীর খোলে নামিয়া নৌকার কাছে গিয়া দেখিল, কাদায় লগি পুতিয়া নৌকা বাঁধা। নিঃশব্দে দড়ি খুলিয়া দিল, তীব্রস্রোতে ডিঙি দেখিতে দেখিতে নিখোঁজ হইয়া গেল। তারপর আবার বাঁধের আড়ালে আড়ালে ঘরে গিয়া দিব্য ভালোমানুষের মতো সে নাক ডাকিতে লাগিল।

পরদিন মালাধর নরহরির বাড়ি গিয়া ধর্না দিয়া পড়িল। প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের কণ্ঠে নরহরি কহিলেন, সেন মশাই, খবর কি?

মালাধর করজোড় করিয়া সবিনয়ে বলিল, রাজ্যের মালিক আপনি—আপনার অজানা কি আছে হুঁজুর?

বাঁধ ভাঙার ঘটনা সে বলিতে লাগিল। বলিল, আপনার কুটুম্বর বিষয়, আপনি একটা বিহিত করে দিন চৌধুরি মশায়।

গাঙ তো আমার হুকুমের গোলাম নয়। আরও চওড়া করে নতুন বাঁধ দিয়ে দেখ দিকি।

মালাধর বিনয়ে আরও কাঁচু-মাচু হইয়া কহিল, আজ্ঞে গাঙ নয়, মানুষ।

কারা মানুষ? নরহরির দৃষ্টি একমুহূর্তে প্রখর হইয়া উঠিল।

মালাধর বলিতে লাগিল, চিনব কি করে হুজুর? যে অন্ধকার! আর

কাছে এগুতেও সাহস হয় না। হাতে সব ঝকমকে সড়কি, শেষকালে এফোঁড়-ওফোঁড় গেঁথে ফেলে যদি!

শ্যামকান্ত সেখানে ছিল। সে সপ্তমে চড়িয়া উঠিল।

ঠিক বরণডাঙার কাজ। চিরশত্রু আমাদের—জানে, আমাদের কুটুম্বর বিষয়, তাই ওখানেও শত্রুতা সাধতে লেগেছে। বিহিত করতেই হবে বাবা, লাভ হোক লোকসান হোক—এ চক আমাদের নিতে হবে।

নরহরি হাসিয়া বলিলেন, তুমি মধ্যবর্তী হয়ে ওটার ব্যবস্থা করে দাও মালাধর। তারপর লাঠি-বৃষ্টি করব ঐখানে। দেখি, কে শত্রুতা করতে আসে!

কিন্তু লাঠি-বৃষ্টি হোক আর যা-ই হোক, কাজ ভুলিবার পাত্র মালাধর নয়। বলিল, আজ্ঞে, তা ঠিক—কিন্তু দরদামের কথাটা—

হরিচরণের আমলে যে তিন-শ টাকার কষাকষি চলিতেছিল, রাগের বশে সেটা একেবারে ধরিয়া দিয়াই নরহরি দাম বলিয়া দিলেন।

মালাধর মাথা নাড়িয়া বলিল, আর কিছু নয়?

ইঙ্গিতটা নরহরি সম্পূর্ণ এড়াইয়া গেলেন। বলিলেন, আর বেশি দিয়ে কে নিচ্ছে এই গোলমেলে মহাল? আমি রাজি হয়ে যাচ্ছি কুটুম্বিতের খাতিরে।

মালাধর বলিল, কে নেয় না নেয়—জানি নে। খবর দেব দিন-পাঁচ-সাতের ভিতরে। আজ্ঞে, আসি তবে—

কিন্তু মালাধরের খবরের আগে খবর আনিল রঘুনাথ। ঢালিপাড়ার নিচে দিয়া সৌদামিনী ঠাকরুনকে নৌকাযোগে যাইতে দেখা গিয়াছে, সঙ্গে মালাধর। বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো একটা আশঙ্কা নরহরির মনে খেলিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন, নৌকা সা'পাড়া দিয়ে উঠল?

হুঁ—

কসবায় গেল নাকি ?

তা জানি নে।

ক্রুদ্ধ বাঘের মতো গর্জন করিয়া নরহরি বলিলেন, সবাই হাত-পা কোলে করে বসে রইলে? গলুইটা টেনে ধরে জিজ্ঞাসা করে নিতে পারলে না?

রঘুনাথ কৈফিয়ৎ দিয়া বলিল, করব কি চৌধুরি মশাই? বড্ড সকাল-বেলা—ছোঁড়াগুলো তখনো সবাই ঘুম থেকে ওঠে নি। নৌকোয় ছিল চিন্তামণি ওস্তাদ—ভাল তোড়জোড় না করে তো এগুনো যায় না।

ইহা যে কত বড় সত্য, নিজে লাঠিয়াল হইয়া নরহরির চেয়ে বেশি জানে আর কে? তিনি আর তর্ক করিলেন না। রঘুনাথকেই কসবায় শশিশেখর উকিলের কাছে পাঠানো হইল। সন্ধ্যার সময় জবাব আসিল, শশিশেখর জানাইয়াছেন, প্রায় তিনগুণ দামে সেই দিনই সৌদামিনী ঠাকরুনের সঙ্গে বউভাসির চক বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে।

নরহরি রক্তচক্ষে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর সহসা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, ঠিক হয়েছে। পাটোয়ারি চাল চালতে গেছি আমি। ও কি আমায় পোষায়? আচ্ছা ঠকিয়ে দিয়েছে মালাধর—

রঘুনাথ লাঠি ঠুকিয়া বলিল, তলে তলে ঐ বেটাই বরণডাঙার সঙ্গে যোগাড়যন্ত্র করেছে। ওকে একটু শিখিয়ে দিতে হবে।

নরহরি হাসিয়া বলিলেন, ছি-ছি! ছুঁচো মারতে যাবে কেন সর্দার? আমার ঘোড়া সাজাতে বল।

(১৬)

ঢালিপাড়ায় কেহ ঘুমায় নাই। কাঠের বড় বড় কুঁদা জ্বলিতেছে, তাহাই ঘিরিয়া সকলে জাগিতেছে। জ্যোৎস্না ডুবিয়া গেল। চারিদিকে আবছা

অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ শোনা গেল, ঘোড়ার খুরের শব্দ—খটাখট-খটাখট—। লোকগুলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

নরহরি চৌধুরি একলাফে নামিয়া সকলের সামনে দাঁড়াইলেন। গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, কাল সকালে পঁচিশখানা লাঙল নামবে বউভাসির চকে—

আনন্দোচ্ছল স্বরে ভানুচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, চকটা তা হলে দিয়ে দিয়েছে ওরা? ভাল হল চৌধুরি মশায়, বেশ হল—খাসা হল—

চৌধুরি হাসিলেন। এ হাসি রঘুনাথ আগে দেখিয়াছে, দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। রঘুনাথের দিকে তাকাইয়া নরহরি প্রশ্ন করিলেন, কেউ জানে না বুঝি এখনো? সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়িয়া গেল, কত বড় নিরর্থক এই প্রশ্ন। নরহরি নিজে আসিয়া না বলা পর্যন্ত তাঁর কথা অতিবড় সুহৃৎকেও ভুল করিয়া রঘুনাথ বলিবে না—ইহা চিরদিনের বিধি।

নরহরি হাসিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, ওরা চক দেয় নি ভানুচাঁদ, আমাদের নিয়ে নিতে হবে। খান পঁচিশেক লাঙল এখানে এসে পৌছুবে রাতারাতি। কাল তোমরা পঁচিশ জনে তাই নিয়ে চকের খোলে নামবে।

ভানুচাঁদের মুখ এক মুহূর্তে ছাইয়ের মতো হইল, তার সকল উৎসাহ নিভিয়া গেল। হাতের লাঠিখানার উপর সে মাথাটা কাত করিয়া দিল।

রঘুনাথ পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। বলিল, কি হল রে ভানু?

ভানু নিরুত্তর।

একটুখানি ঠেলা দিয়া রঘুনাথ আবার ডাকিল, কথা বলছিস না কেন? কি হল তোর?

ভানুচাঁদ বলিল, ওসব আমি পারব না সর্দার। মাথা নাড়া দিয়া বলিতে লাগিল, না—কিছুতেই পেরে উঠব না, বুঝলে? সেদিন এল কোদাল, আজ আসছে লাঙল। তবু তো কোদালের কাজ ছিল রাত্তিরবেলা। দিন দুপুরে চাষাদের সঙ্গে লাঙল ঠেলতে পারব না আমি।

বলিতে বলিতে ভানুচাঁদের গলা ধরিয়া আসিল।

প্রায় সমস্ত কথাই নরহরির কানে যাইতেছিল। বলিলেন, ও রঘুনাথ বলে কি ছোকরা?

রঘুনাথ বলিবার আগেই ভানুচাঁদ আগাইয়া গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, চৌধুরি মশায়, তোমার কামারে কেবল কোদাল আর লাঙলই গড়ছে—সড়কি-বল্লম গড়ে না আজকাল? ছিলাম ঢালি, এখন কি চাষা বানিয়ে তুলবে আমাদের?

চৌধুরি হাসিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন, হুকুম দিয়ে দিয়েছি বাপু, হাকিম নড়বে তো হুকুম নড়বে না। কাল সকালে পঁচিশখানা লাঙল চকে নামবেই—আর বাঁধের উপর বসে তামাক-টামাক খাবে আরও জন পঞ্চাশ। তা ছাড়া গাঙের খোলে নৌকোর মধ্যে—ঘুমোতে পারে, দাবা-পাশা খেলতে পারে—তা-ও ধর আর শ-খানেক আন্দাজ। তুমি কোন দলে থাকবে ভানুচাঁদ?

ভানুচাঁদ আগ্রহের স্বরে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, আমার ঐ তামাক খাওয়ার কাজ। লাঠি আর হুঁকো নিয়ে বাঁধে আমি টহল দিয়ে দিয়ে বেড়াব —ঐটে বেশ পারব।

প্রসন্নমুখে সকলের দিকে তাকাইয়া নরহরি ঘোড়ায় চড়িয়া সপ্ করিয়া চাবুকের ঘা দিলেন। মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, কিন্তু লাঙলের কাজটাও মন্দ ছিল না হে! মাটি চষতে হবে না বেশি—বরণডাঙার কেউ যদি আসে, বুকের উপর দিয়ে ফলা টানতে হবে। পারবে না তোমরা?

হাঁ হাঁ—করিয়া অনেকগুলা কণ্ঠস্বর বাঘের মতো গর্জন করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে নরহরি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ঢালিরা যে যার ঘরে ফিরিতে লাগিল। ভানুচাঁদকে উদ্দেশ করিয়া রঘুনাথ বলিল, লাঙল একটু ধরে-টরে রাখলে বুদ্ধির কাজ হত কিন্তু। এই পুরাণো দিনকাল আর থাকছে না বাপু। বন্দুক-গুলি-গোলার পাল্লায় লাঠি আর কতদিন?

ভানুচাঁদ হাসিয়া বলিল, যতদিন এই হাত দু'খানা কাটা না যাচ্ছে সর্দার মরদ-মানুষের হাত থাকবে, লাঠি থাকবে না—এ কি রকম কথা!

পায়ের নিচে জোয়ারের জল ছলছল করিয়া লাগিতেছে। রঘুনাথ বড় স্নেহে ভানুচাঁদের কাঁধে হাত রাখিল। ভানুচাঁদ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মুখের সামনে মুখ আনিয়া বলিতে লাগিল, ভাবছ কেন সর্দার? যতদিন চলে চলুক। যখন চলবে না, গাঙের জল তো আর শুকিয়ে যাবে না?

(১৭)

সৌদামিনী ঠাকরুনের পানসি কসবা হইতে ফিরিতেছিল। খুব ভোরবেলা, অল্প অল্প কুয়াসা করিয়াছে। মালাধর বলিল, ভাল দেখা যাচ্ছে না মা, উই যে কালো কালো—উঁহু উঁহু—ওদিকে কেন? ওদিককার ওসব হল বাঘা চৌধুরির —আমাদের চকের সীমানা দক্ষিণের ঐ বাবলাবন থেকে।

চিন্তামণি পিছনের গলুয়ে তামাক সাজিতেছিল। কলিকা ফেলিয়া মচ-মচ করিয়া ছুঁই-এর উপর দিয়া চলিয়া আসিল। মালাধরের নির্দেশমতো ঠাহর করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সোজা বাঁশের লাঠি লইয়া চিরকাল কারবার, সীমানা-সরহদ্দ তল্লাস করিবার ধৈর্য তার ধাতে নাই। কোটরের মধ্যে চোখ দু'টা চক-চক করিয়া উঠিল। বলিল, মা-ঠাকরুন, ডাকব একবার কর্তাভাইকে? তুমি একেবারে এক রাজ্যি কিনে ফেলেছ, দাদাভাই আমার দেখবে না একটু?

এলোমেলো শয্যায় কীর্তিনারায়ণ অঘোরে ঘুমাইয়া আছে, হাত-পা গুটাইয়া এক জায়গায় আসিয়াছে। ঘোড়ায় চড়িতে গিয়া আছাড় খাইয়া কপাল কাটিয়া গিয়াছিল, তার দীর্ঘ রেখা জয়পত্রের মতো আঁকিয়া আছে। চিন্তামণি দুই পা আগাইয়া লেপটা আস্তে আস্তে কীর্তিনারায়ণের গায়ের উপর তুলিয়া দিল। মালাধরের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, তুমি কি বল গো সেন

মশাই, নৌকোটা লাগান যাক এইখানে? দাদাভাইকে কাঁধে নিয়ে চকের উপর দিয়ে সোজা দেব এক ছুট। তোমার এই পানসির আগে আগে গিয়ে বাড়ি উঠব। রাজা তার রাজ্যিপাট দেখবে না, তাই কি হয়?

মালাধর ঘাড় নাড়িয়া তৎক্ষণাৎ সায় দিল, নিশ্চয়, নিশ্চয়—দেখবেন বই কি! ঐ একবার ছায়া দেখিয়ে গেলেই হল। তারপর আমি রইলাম, আর রইল চকের প্রজাপাটক। নজর নিদেনপক্ষে যোল আনা ধরলেও একটি হাজার। এখন না দেয়, খাজানা দিতে তো আসতে হবে—তখন? আরে, আরে—বেটারা বেয়েই চলল যে! ডাইনে মেরে ধর্ নৌকো।

সৌদামিনী ইহারই মধ্যে একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। চোখে তাঁর জল আসিয়াছিল। ঐটুকু এক চকে চিন্তামণির এত আহ্লাদ, আর পুরাণো আমলে কর্তা যেদিন নাজির-ঘেরির গোটা তালুক কিনিয়া ফেলিলেন! সে একদিন গিয়াছে। পাইক-বরকন্দাজরা সমস্ত দিন আমরুল শাক ঘসিয়া ঘসিয়া চাপড়াশ সোনার মতো চকচকে করিয়া ফেলিল। তারা আগে আগে চলিল, পিছনে কর্তার পালকি, তার পিছনে পঙ্গপালের মতো কর্তার হাতে-ধরিয়া-শেখানো লাঠিয়ালের দল। পাকা বাঁশের দীর্ঘ লাঠি উচাইয়া সারবন্দি সকলে চলিয়াছে। সে-সব যেন কালিকার কথা। মাসটা বৈশাখ, বড় গরম, যাই-যাই করিয়া রওনা হইতে একেবারে ঘোর হইয়া গেল। আকাশে খণ্ড-চাঁদ উঠিতেছে। সৌদামিনী হাসিয়া বলিয়াছিলেন, বিয়ে করতে চলেছ যেন! উলু দেব? কর্তা রসিকতা করিয়া একটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইলেন—আর ঘর-ফাটানো হাসি! শ্লোক বলিতেন তিনি কথায় কথায়, সে সব সৌদামিনী এক বর্ণ বুঝিতেন না—হাসিটা কিন্তু আজো স্পষ্ট কানে বাজে। হাসি তো নয় —যেন জোয়ারের ঢেউ, চারিদিক একেবারে তোড়পাড় করিয়া দিত।

আগে জমিদারি ছিল না, ঐ নাজির-ঘেরি হইতে জমিদারির পত্তন। সৌদামিনীর বড় ভাই ভগ্নীপতিকে সদুপদেশ দিয়া পাঠাইলেন,

বিষয়-সম্পত্তি কিনে গেলেই হয় না। ভাল করে আর একবার ভায়াকে বিবেচনা করতে বোলো, এ চাতালের উপর বসে বসে ভুঁড়ি দুলিয়ে পুঁথি-পড়া নয়। শিবনারায়ণ এদিকে ভালমানুষ লোক, সংস্কৃত ও ফারসি জানিতেন চমৎকার। সে আমলের কালেক্টরির বাংলানবিশ দেওয়ান। লাঠি খেলিতেন, কুস্তি করিতেন, আর অবসর পাইলেই পণ্ডিত মহাশয়দের লইয়া কাব্যচর্চা হইত। কিন্তু জমিদার হইয়া কাব্যের পুঁথি ক্রমশ সিন্দুকে উঠিল। দেখাইয়া দিলেন, সম্পত্তি রক্ষা করিয়া বাড়াইয়া-গুছাইতেও সক্ষম তিনি। কর্তা থাকিলে আজ কি এমনটা হইত, সৌদামিনীকে এমন ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে হইত? সেদিনের লজ্জাবতী বধূ আজ বাঘিনীর মতো ঠাঁটটা আগলাইয়া বসিয়া আছেন। যখন-তখন ছেলের দিকে চাহিয়া নিশ্বাস পড়ে, কবে যে সে মানুষ হইয়া উঠিবে!

হঠাৎ নৌকা ঘুরিয়া যাইতে সৌদামিনীর চমক ভাঙিল। হুকুম দিলেন, এখানে বাঁধতে হবে না, চলুক যেমন চলছে—

মালাধর সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ—চালা, চালা নৌকো। তোড়জোড় না করে ফস করে অমনি বাঁধলেই হল—নাঃ? আপনি জানেন না গিন্নি-মা, আজকাল এমন হয়েছে—চৌধুরির ঐ ভূতপ্রেতগুলো হক্ না হক্ মাথায় লাঠি মেরে বসে। আখেরের ভাবনা ভাবে না। তারপর গলা নিচু করিয়া কহিল, কিন্তু একটুখানি ধরুক মা। আমাকে নেমে যেতে হবে। আমার বাড়ি ঐ সোজা। মিছেমিছি ঘুরে মরব কেন অদ্দূর?

চিন্তামণি নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। সৌদামিনী বলিলেন, রাগ করলে ওস্তাদ? অত বড় ঐ ছেলে—তুমি বললে, পিঠে নিয়ে মাঠ ভাঙবে। পিঠ তা হলে কুঁজো হয়ে যাবে, বুক ফুলিয়ে লাঠি ধরতে হবে না আর কোনদিন।

ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া নদী-জলের দিকে তাকাইয়া চিন্তামণি দাঁড়াইয়া রহিল। মৃদু হাসিয়া সৌদামিনী বলিলেন, আমরা বাজে লোক কি না! ওস্তাদ আমাদের সঙ্গে কথাই বলে না।

ওস্তাদ বলিল, বলাবলি আর কি মা, আর তো সেদিন নেই—বুড়ো অকর্মা হয়েছি, দুধের ছেলেটাও বয়ে নিতে পারি নে। তাই বলি, ছুটি দাও এবার—চলে যাই—

সৌদামিনী খুব হাসিতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আ—হা, সে বুঝি তুমি! অকর্মা আমার ঐ ছেলে। যেখানে যাব আঁচল ধরে সঙ্গে চলেছেন। ঐ ননীগোপাল আবার মানুষের মতো হয়ে তোমাদের সঙ্গে মহালে ঘুরবে—আ আমার কপাল!

চিন্তামণি রাগিয়া আগুন হইল। বলিল, তাই বুঝি সোনার পালঙ্কে তোমার ননীগোপালকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছ মা? কার ছেলে, হুঁশ আছে তা? খালি কাঠের উপর পড়ে রয়েছে, শীতে ধনুকের মতো হয়ে গেছে, কাপড়খানা গায়ে তুলে দেবার ফুরসৎ তোমাদের কারো নেই—এতেও মনোবাঞ্ছা পুরল না মা?

ঘাটে সারবন্দি বাছাড়ি নৌকা। মালাধর হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল, দেখিস, দেখিস মাঝি, লাগে না যেন—সামাল! ঐ ডান পাশ দিয়ে—ঐ বালির চরটার ওখানে ধরবি।

বলিতে বলিতেই ঠক করিয়া পানসির মাথা একটা নৌকার গায়ে গিয়া লাগিল। ছই-এর ভিতর হইতে অমনি মধুরকণ্ঠে প্রশ্ন আসিল, কোন্ নবাবের নাতি গো?

মালাধর বলিল, হেঁ হেঁ বাবা, গোলপাতা কাটতে চলেছ? মেজাজ বড্ড গরম যে! থাম, থাম। আগে বসি গিয়ে কাছারি। সৌদামিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, মা, এই খুঁটো-সেলামি আদায় করে দেব আপনাকে বছরে পাঁচ-শ টাকা।

আশ্চর্য হইয়া সকলে মালাধরের মুখের দিকে তাকাইল।

মালাধর গম্ভীর হইয়া ঘাড় নাড়িল। বলিতে লাগিল, আলবৎ! বাপের

সুপুত্তুর হয়ে সব খুঁটো-সেলামি দিয়ে যাবে। এই গাঙ না হয় কোম্পানির, পাড় তো আমাদের চকের সামিল। পাড়ে খুঁটো পুঁততে হবে না? মাঙনা কাছি মেরে সব যে পড়ে পড়ে ঘুমোবেন, সে হচ্ছে না। এক এক খুঁটোয় খাজনা চার চার আনা। দেখুন না কি করি।

সৌদামিনী চিন্তামণির দিকে ফিরিয়া হাসিমুখে বলিলেন, বোসো, বসে পড় না ওস্তাদ। ঐ খুঁটো-সেলামি দড়ি-সেলামি কলসি-সেলামি—শুনে নাও সব মালাধরের কাছ থেকে। সর্দার-পাইক তুমি—কাজে লাগবে।

চিন্তামণি রুক্ষ-কণ্ঠে কহিল, ও সব আমাদের এখানে হবে না সেন মশাই। তোমার আগের মনিবের কাছে চলে থাকে তো চলেছে—আমাদের এখানে নিয়ম-কানুন আলাদা। আসল খাজনা—তাই গিন্নি-মা মাপ করে দেন কথায় কথায়—তার হেনোতেনো ছাইভস্ম!

সৌদামিনী বলিলেন, তবু শিখে রাখ সমস্ত। পরিণামে কি হবে ঠিক কি? পেট তো মানবে না! ছেলে যে এদিকে দিগ্‌গজ হয়ে উঠছেন। 'ক' লিখতে একেবারে কেঁদেই খুন।

মালাধর প্রশ্ন করিল, কেন?

মুখ টিপিয়া হাসিয়া সৌদামিনী বলিলেন, বোধ হয় কৃষ্ণ নাম মনে পড়ে। কিম্বা হয়তো কলম ভেঙে যায়—

এইবারে চিন্তামণির মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। ঘুমন্ত কীর্তিনারায়ণের দিকে আর একবার স্নেহ-দৃষ্টিতে চাহিল। বলিল, ভাঙবে না? ওঁর কবজির হাড় দেখছ মা, চওড়া কি রকম! খাগের কলম টিকবে কেন? লাঠি—পাকা পাঁচ-হাতি বাঁশের লাঠি, তার কমে মানাবে না ও-হাতে। দাদামণিকে আমি লাঠিখেলা শেখাব। সব শিখিয়ে দিয়ে যাব—কর্তার কাছ থেকে যা পেয়েছি, সমস্ত।

মালাধর বলিল, কিন্তু ও কথা বললে হবে কেন মা? খোকাবাবু লেখেন তো বেশ। কসবায় দেখলাম এবার—

চিন্তামণি বাধা দিয়া অধীর কণ্ঠে কহিল, তার গরজটাই বা কি? কিচ্ছু দরকার নেই। পুঁথি পড়তে হয়, নিয়ে আসা যাবে পণ্ডিত-মশায়দের। তাঁরা পড়ে পড়ে শোনাবেন। আর তোমরা আধকুড়ি নায়েব-গোমস্তা রইলে, কর্তাভাই লিখতেই বা যাবে কোন দুঃখে?

মালাধর তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিল, তা ঠিক। কি দুঃখে লেখাপড়া করতে যাবেন? কিন্তু যা উনি শিখেছেন, তাই বা ক'জন জানে? কসবায় দেখলাম এবার, দিব্যি সই দিয়ে দিলেন—গোটা গোটা মুক্তোর মতো অক্ষর। কলম ভাঙা-টাঙা মিছে কথা। একটু থামিয়া আবার বলিল, বাঘা চৌধুরির চেয়ে অনেক ভাল লেখেন উনি।

চিন্তামণি তখন আপনার ঝোঁকেই বলিয়া চলিয়াছে, হুকুম দাও মা-ঠাকরুন, দাদাকে আমি লাঠি শেখাই। বাড়ি যা খুলবে ও-হাতে! আজ ওঁকে ভরসা করে দিতে পারলে না মা, কিন্তু গুরুর নাম করে বলছি, কর্তাভাই আমার হাজার লোকের মহড়া নেবে একদিন। আমি বুড়োমানুষ, আমি হয়তো বেঁচে থাকব না, তুমি দেখো—

সৌদামিনী শান্ত দৃষ্টি তুলিয়া চিন্তামণির দিকে একটুখানি চাহিয়া রহিলেন। বলিলেন, ভরসা করে দিতে পারলাম না, তাই বুঝি! এই বুঝলে তুমি ওস্তাদ? চকের নতুন কাছারি বাঁধা হোক, পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে ষোল-বেহারার পালকি হাঁকিয়ে তোমার দাদাভাই সেখানে গিয়ে উঠবে। এখন এমনি-এমনি গেলে কি তোমাদের ইজ্জত থাকে? ওকি—ওকি—

নৌকা কূলের কাছাকাছি আসিতেই মালাধর লাফাইয়া পড়িল। চটিসুদ্ধ সে পড়িল গিয়া একেবারে কাদার মধ্যে। লোনা কাদা—কে যেন যত্ন করিয়া ছানিয়া নিভাঁজ করিয়া রাখিয়াছে। মালাধরের হাঁটু অবধি তলাইয়া গেল। পানসির সকলে হাসিয়া উঠিল। মালাধরের দৃক্‌পাত নাই। দুই আঙুল তুলিয়া দেখাইয়া সে কহিতে লাগিল, কিছু ভাবতে হবে না মা, এই দুটো মাস সবুর করুন আটচালা

কাছারি-ঘর তুলে দিচ্ছি। বাঁশ-খড় সব ভূতে যোগাবে, এক পয়সাও চাইনে ঘর থেকে। মাত্তোর দুটো মাস।

(১৮)

মালাধর বাঁধের উপর দিয়া যাইতেছিল। হৈ-চৈ শুনিয়া তাকাইয়া দেখিল, একটু দূরে দল বাঁধিয়া কারা চাষে লাগিয়াছে। শব্দ-সাড়া খুবই হইতেছে, গরু বড় চলিতেছে না, লাঙলের মুঠা ধরিয়া দশ-বিশটা জোয়ান সারবন্দি দাঁড়াইয়া হাসাহাসি করিতেছে।

হাঁক দিল, কারা ?

লোকগুলা তাকাইয়াও দেখিল না।

মালাধর বলিল, কার জমিতে কে লাঙল দেয় ? শেষকালে জেলের ঘানি ঘুরিয়ে মরবি বেটারা ? সব নতুন বন্দোবস্ত হবে, সেলামি লাগবে—হেঁ হেঁ, মাঙনা নয়।

বাঁধের আড়াল হইতে ভানুচাঁদ যেন হঠাৎ পাতাল ফুঁড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হাতে হুঁকা। দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে ভানু বলিল, তামাক ইচ্ছে করবে সেন মশাই ? সাজা রয়েছে। এস না এদিকে।

মালাধরের কণ্ঠ এক মুহূর্তে একেবারে খাদে নামিয়া আসিল। বলিল, না বাবা, তামাক নয়। বেলা হয়ে গেছে বড্ড। বলছিলাম ছোঁড়াগুলোকে। ওরা সব বুঝি তোমাদেরই পাড়ার ? সবাই আমরা পাড়াপড়শি, পর তো নয়—তাই বলছিলাম, বাপধনেরা, এই যে সকালবেলা পরের জমিতে লাঙল নামিয়েছ, একটা ফ্যাসাদ যদি বাধে আমাদেরই আবার ঠেকাবার জন্য দৌড়তে হবে।

ভানুচাঁদ বিস্ময়ের ভাবে কহিল, পরের জমি হল কোথায় ? জমি তো আমাদের। বাঁধের গায়ে লাঠিটা ঠেশ দেওয়া ছিল, অন্যমনস্ক ভাবে সেটা হাতে করিয়া তুলিল। বলিল, কেন—তুমি সেন মশাই, সমস্ত তো জান। মনে পড়ছে না বুঝি ?

মালাধর তাড়াতাড়ি বলিল, পড়ছে বই কি বাবা। জমি তোমাদের নয় তো

কার আবার ? সাত পুরুষে জমি চৌধুরি মশায়ের। খুব মনে পড়ছে। হি-হি করিয়া মালাধর হাসিতে লাগিল। বলিল, তুপুর রাতে ঝপাঝপ কোদাল মারছিলে, কাছি খুলে ডিঙি গেল ভেসে। তিন দিন পরে দীঘ্‌লের বাঁধাল থেকে সেই ডিঙি ত্রৈলোক্য গিয়ে নিয়ে এল। খুব মনে আছে।

ভানুচাঁদও হাসিতেছিল। হাসি থামাইয়া বলিল, কাছি খুলে গেল না হাতী। ও ঠিক তোমার কাজ, ডিঙি তুমি খুলে দিয়েছিলে। অন্ধকারে তখন ঠাহর করতে পারি নি যে! নইলে আর কিছু না হোক, হাতে তো কোদাল ছিল একখানা করে—

মালাধর জিভ কাটিল। সর্বনাশ! অমন কাজ করতে পারি আমি? না বাবা, কোদালের কোপ-টোপ তোমরা দেখে শুনে জায়গা বিশেষ ঝেড়ো।

খানিকক্ষণ ধরিয়া সে হাসিল। তারপর গলা খাটো করিয়া বলিল, সে ছিল রাত-বিরেতের কাজ—সাক্ষি মেলে না। কিন্তু দিন-তুপুরে এই যে হৈ-হৈ করে গরু তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, এটা কি রকম হচ্ছে বল তো? এখন যদি গ্রামের ওদের সাক্ষি মেনে দেয় একনম্বর ফৌজদারি ঠুকে! চৌধুরি মশায়ের আব কি হবে, মরতে মরবি তোরাই তো বাবা।

কে কথা বলে রে ভানু? আরে, আরে—আমাদের মালাধর যে!

গলা শুনিয়া মালাধর পিছন ফিরিল। রঘুনাথ সর্দার। সে একেবারে পিছনে আসিয়া পড়িয়াছে। আশ্চর্য হইয়া রঘুনাথ বলিল, কাল দেখে এলাম পরেশ উকিলের ওখানে—ফিরলে কখন বল? কাজকর্ম চুকল তো?

মালাধর তাচ্ছিল্যের সুরে কহিল, ভারি তো কাজকর্ম—হ্যাঃ! মেয়েমানুস অবোলা জাত—সঙ্গে করে নিয়ে গেল নাছোড়বান্দা হয়ে। সমস্ত রাত মশা তাড়িয়ে মরেছি। তারপর শরীর-গতিক ভালো তো বাবা? চৌধুরি মশায় আছেন ভালো?

রঘুনাথ কহিল, চৌধুরি মশায় যে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

পাংশুমুখে মালাধর বলিল, কেন ? কেন বল দিকি ?

. রঘুনাথ হাসিয়া বলিল, চাকরি-টাকরি দেবেন বোধ হয়।

মালাধর তাড়াতাড়ি কহিল, তা দেবেন বই কি ! চাকরি আমাদের পেশা। চৌধুরি মশায় বিচক্ষণ লোক—জানেন তো সমস্তই। তা বেশ, আমি দেখা করব ওঁর সঙ্গে।

এক পা দু'পা করিয়া মালাধর বেশ খানিকটা আগাইয়াই ছিল, এবারে সে হন-হন করিয়া হাঁটিতে শুরু করিল। পিছন হইতে রঘুনাথ বলিল, দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে যাও—এক্ষুণি দেখা হয়ে যাবে। চৌধুরি মশায় চকের চাষ দেখতে আসছেন।

ততক্ষণে মালাধর পথ ছাড়িয়া গ্রামের সীমানায় পা দিয়াছে।

কিন্তু কি ক্ষণে সেদিন রাত্রি পোহাইয়াছিল, গ্রামে পৌছিয়াও গ্রহ কাটিল না। মোড় ঘুরিয়াই বাঘ, স্বয়ং বাঘাহরি চৌধুরি। সঙ্গে আরও যেন কে কে—একজন তো মধ্যমপাড়ার যজ্ঞেশ্বর চাটুজ্জে। তাকাইয়া দেখার ফুরসৎ মালাধরের ছিল না। সে দিকটায় পানের বরোজ ও সুপারি-বন। ধাঁ করিয়া আগে তো রাস্তা হইতে নামিয়া পড়িল, তারপর কোন বনে ঢুকিবে সেটা পরের বিবেচনা। কিন্তু শনির নজর এড়ায় নাই। তীক্ষ্ণ কণ্ঠের হাঁক আসিল, কে ? কে ওখানে ?

মালাধর মুখ ফিরাইয়া কোন গতিকে কহিল, এই যে—আমি। প্রশ্ন করিয়াছে শ্যামকান্ত, সে-ও চৌধুরির পিছু পিছু চক দেখিতে চলিয়াছে। যজ্ঞেশ্বর আগের কথার খেই ধরিয়া বলিতেছিলেন, ফাঁকা মাঠের মধ্যে কাছারি করতে যাবেন কেন ? সে উচিত হবে না চৌধুরি মশাই। এক ফুলকি আগুনের মাত্র ওয়াস্তা। তার চেয়ে যেমন ছিল—গ্রামের মধ্যে থাকুক। ঐ মালাধরকে জিজ্ঞাসা করুন বরং। ও তো হাল-চাল সমস্ত জানে—

কথা শুনিয়া মালাধর ঘুরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, কিছু ভাববেন না চৌধুরি

মশাই। ভার আমাকেই দিন। কাছারি-টাছারি সমস্ত বেঁধে দেব। আটচালা চৌরিঘর দরোয়ানের দেউড়ি সমস্ত। ছুটো মাস শুধু সময় দেবেন, দেখে নেবেন তারপর।

চৌধুরি বলিলেন, তুমি ওখানে কি করছ?

মালাধর বলিল, আজ্ঞে আপনারই কাছে যাচ্ছিলাম।

হাসিমুখে নরহরি বলিলেন, পথটা বেছেছ ভাল। কিন্তু আমার কাছে কেন বল দিকি?

মালাধর ততক্ষণে ছু'-এক পা করিয়া রাস্তার দিকে আগাইতেছিল। অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া বলিল, আর বলেন কেন মশাই! চাকরি—হা-হা-হা—ছা-পোষা মানুষ, চক দখল করুন, যা-ই করুন—চকের আদায়ের কাজটা যেন আমার থাকে। নতুন কাউকে বহাল করে বসবেন না। রঘুনাথও বলল সেই কথা—বলল, যাও, চৌধুরি মশায়ের সঙ্গে দেখা কর গিয়ে—তিনি তো জানেন তোমাকে।

শ্যামকান্ত ব্যঙ্গের সুরে কহিল, তা জানেন বটে, আগাগোড়া সমস্ত জানেন। তোমার চাকরি যাবে কোথায়? কেন, বরণডাঙার উনি কি বলছেন?

মালাধর বলিল, আরে রামোঃ। বরণডাঙা করবে মহাল শাসন! এক নম্বর মেয়েমানুষ, আর ছুই নম্বর হল এক পুঁটকে ছোঁড়া। চৌধুরি মশায়ের যমদূতগুলো কবে ঐ মা-ব্যাটা আর নায়েব-গোমস্তা সবসুদ্ধ গোটা চকটাই মালঞ্চের তলায় রেখে আসবে, তার কিছু ঠিক-ঠিকানা আছে? আমাদের আখেরের ভাবনা আছে মশাই। বলিয়া সে একবার নরহরির দিকে, একবার আর সকলের দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল।

শ্রোতারাও হাসিতে লাগিল। হাসিলেন না কেবল নরহরি। গম্ভীরস্বরে বলিলেন, চাকরি তোমায় দেব মালাধর। কাল বিকেলে দেখা কোরো।

যে আজ্ঞে—বলিয়া তাড়াতাড়ি পায়ের ধূলা হইয়া মালাধর বিদায় হইল।

শ্যামকান্ত খানিক তাহার গমন-পথের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া অনেকটা যেন আপনার মনে বলিয়া উঠিল, আস্পর্ধা বটে লোকটার !

মৃদু হাসিয়া নরহরি বলিলেন, তা ঠিক, মালাধর আমাদের চক্ষুলজ্জা করে না। একটু চুপ থাকিয়া বলিলেন, তা ছাড়া চিরকাল ঐ চকে কাজ করে আসছে। শ্যামগঞ্জে বরণডাঙায় গণ্ডগোল জমে উঠল। এ বয়সে ও-ই বা যায় কোথায় ?

শ্যামকান্ত বলিল, কিন্তু গণ্ডগোলের মূলে তো ও-ই। ও-ই বরণডাঙার গিন্নিকে নিয়ে এল এর মধ্যে।

নরহরি হাসিয়া বলিলেন, উঃ—আমাকে সুদ্ধ ঘোল খাইয়ে দিল। কম লোক মালাধর ! তাই তো দেখা করতে বললাম। এবার ওকে নিশ্চয় বেঁধে ফেলব।

শ্যামকান্ত আশ্চর্য হইয়া বলিল, ওকে বিশ্বাস করবেন ?

নরহরি বলিলেন, বিশ্বাস করব কেন ? চাকরি দেব।

যজ্ঞেশ্বর বলিলেন, তা লোকটার ক্ষমতা আছে বটে ! কিন্তু বাবাজি যা বললেন, তা-ও দেখুন ভেবে। বড় বিশ্বাসঘাতক লোক—পয়সা পেলে লোকটা না পারে এমন কাজ নেই।

নরহরি বলিলেন, পয়সা-কড়ি যাতে পায়, সেই উপায় করতে হবে তা হলে। জমিদারবাড়ি হাতী-ঘোড়া জীব-জানোয়ার পুষতে হয়, ঐ রকম মালাধরও দু-চারটে পুষতে হয়। এসব আপনারা বুঝবেন না চাটুজ্জে মশায়, চাকরি আমি ওকে দেবই। আর আমাদের বড়বাবুও ওকে পছন্দ করবেন—আমার চেয়ে বেশি করবেন। আগে থাকতে এই বলে রাখছি।

বলিয়া শ্যামকান্তকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

গামছা কাঁধে তেল মাখিয়া জন সাত-আট দীঘির ঘাটে চলিয়াছে। হাঁক-ডাক করিয়া মালাধর তাদের উঠানে আনিল। বলিতে লাগিল, সু-খবর শুনে যান দাদা, আর তহ্‌শিলদার নয়—সদর নায়েব, হেঁ হেঁ, একদম হরিচরণ চাটুজ্জে। বিশটা বউভাসি এখন শর্মার মুঠোর মধ্যে। চৌধুরি মশায় তাই বলছিলেন—নায়েব যা, নবাবও তাই। ঐ কেবল নামের হেরফের।

একজনে প্রশ্ন করিল, বাঘা চৌধুরির চাকরি নিয়েছ নাকি ?

মালাধর চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, মুশকিল তো হচ্ছে ঐ। দুই সূর্যির উদয় হল—কার রোদে এখন ধান শুকোই ? বরণডাঙার গিন্নি তো হাত-পা কোলে করে বসে আছেন—বলেন, যা কর তুমি মালাধর। আর ওদিকে চৌধুরিও নাছোড়বান্দা। বিকেলে গিয়ে চেক-মুড়ি আনতে বলেছেন। মামলা আর মাথা ফাটাফাটি চলুক এইবার, কে মালিক সাব্যস্ত হতে থাকুক। আমি ওসব তালে নেই। আমার কি, আমি নির্গোলে আদায়-পত্তোর করে যাই কাল সকাল থেকে।

পরদিন বরণডাঙা হইতে হারাণ সরকার আসিয়া উপস্থিত। বলিল, মা পাঠিয়েছেন।

একগাল হাসিয়া মালাধর বলিল, বেশ, বোলো মা'কে। কিছু ভাবনা নেই। আদায়ের আরম্ভ কালকে থেকে।

হারাণ চোখ-মুখ ঘুরাইয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, তা যেন হল। কিন্তু চৌধুরি যে চকে লাঙল লাগিয়েছিল। বলে, চক নাকি তার। চক হল তার, আর আমরা পুঁটিমাছের মতো করকরে টাকা গুণে দিয়ে এলাম—সে হয়ে গেল ভুয়ো ! মা তোমাকে ডেকেছেন আজ।

মালাধর বলিল, যাব বিকেলে।

পরদিন পুনশ্চ হারাণ আসিল। কই? কি হল?

মালাধর বলিল, একদিনে আর কি হবে ভাই? প্রজাপাটক বিস্তর খবর হয়ে গেছে। ছুটো মাস দেরি করতে বল। সব হয়ে যাবে—আটচালা কাছারি-বাড়ি দেউড়ি সমেত।

হারাণ বলিল, সে কথা নয়, তোমার বরণডাঙা যাবার কথা। রোজ ওরা হৈ-হৈ করে লাঙল চালাচ্ছে, দখল সাব্যস্ত করছে, বুঝলে না? একটা বিহিত করা দরকার। তুমি একবার চল সেন মশাই।

মালাধর বলিল, বিকেলে যাব।

হারাণ বলিল, কালও তো বলেছিলে ঐ কথা।

মালাধর চটিয়া বলিল, আজকে আবার একটা নতুন কথা বলব না কি? সে লোক আমি নই। বিকেলবেলা যাব, বলে দিও।

সকালের পর ছুপুর, তারপরেই বিকাল আসিয়া থাকে। রোজই আসে। মালাধর বিকালে হয়তো যাইবেই, সেজন্য তাড়া কিছু নাই। কিন্তু প্রজাপাটক ডাকাডাকি করিয়া এদিকে মালাধর বিষম তাড়া লাগাইল। ভোরবেলা হাতবাক্স কোলে করিয়া দুর্গানাম লিখিয়া সে চণ্ডীমণ্ডপে বসে। পাইক-বরকন্দাজ নাই, কিন্তু তাহাতে যায় আসে না। বেলা প্রখরখানেক হইতে প্রজাদের বাড়ি বাড়ি নিজেই দপ্তর হাতে ঘুরিতে শুরু করে। এই রকম সন্ধ্যা অবধি চলে। সন্ধ্যার পর রেড়ির তেলের দীপ জ্বালিয়া আবার চণ্ডীমণ্ডপে বসে। কিন্তু আদায়পত্রের সুবিধা হয় না বিশেষ কিছু। লোকে জিজ্ঞাসা করে, কোন তরফের আদায় করছ সেন মশাই?

মালাধর বলে, তাতে দরকার কি বাবু? তোমাদের হকের খাজনা, শোধ করে যাও, ব্যস!

কিন্তু ওদিকে কসবায় ছুটোছুটি আরম্ভ হয়ে গেছে, সে খবর রাখ?

মালাধর বলে, নিষ্পত্তি তো হবে একটা। আমার এ কায়েমি চাকরি, আমি নড়ছি নে কিছুতে। আসে বরণডাঙা—ভালো, আসেন চৌধুরি, আরও ভালো। আমি করচা লিখে শেষ করে রেখেছি। মালিকের নামের জায়গাটা ফাঁক রয়েছে কেবল।

তুমি কোন দলে সেন মশাই ?

মালাধর হাসিয়া বলে, তোমরা যে দলে। বরণডাঙার গিন্নি রোক টাকা গুণে দিয়েছেন। সেটা তো আর মিথ্যে নয়। বেশ তো—দাও টাকা, রসিদ দিচ্ছি, বরণডাঙার মোহর-মারা রসিদ—

চৌধুরির লোক এসে শাসিয়ে গেছে, বরণডাঙাদের টাকা দিলে ঘাড় ভাঙবে।

তবে চৌধুরির টাকাই দাও। কাঁচা-রসিদ কিন্তু। বিকেলে গিয়ে চেকমুড়ি আনব। সেই সময় এস, একেবারে দাখলে পেয়ে যাবে।

এত তর্কাতর্কি করিয়াও কিন্তু লোকগুলা গাঁটের টাকা গাঁটে লইয়া পিছাইয়া পড়ে।

একদিন উঠান হইতে আওয়াজ আসিল, মালাধর আছ ?

উঁকি মারিয়া দেখিয়া মালাধর তটস্থ হইয়া দাঁড়াইল। এস এস, রঘুনাথ সর্দার যে! বলি, খবর ভালো ? চৌধুরি মশায় ভালো আছেন ?

রঘুনাথ বলিল, তলব হয়েছে।

হবারই কথা। বিকেলে যাব।

রঘুনাথ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উঁহু, এখনই।

মালাধর হাসিয়া বলিল, কেন, চৌধুরি মশায়ের ব্রাহ্মণ-ভোজনের ইচ্ছে হল নাকি আবার ? আমি তো ব্রাহ্মণ নই।

রঘুনাথ চুপি-চুপি বলিল, বাঘা চৌধুরির আমল চলে যাচ্ছে। শ্যামকান্ত লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে গদি চেপে বসেছেন। এ দেবতা একেবারে কাঁচাখেগো।

এখন আর ভোজন-টোজন নয়। একদম সোজা হুকুম, নিয়ে এস সঙ্গে করে। না আসতে চায়, বেঁধে এনো।

মালাধর শুষ্কমুখে বলিল, ভয়ের কথা হয়ে উঠল বড্ড। কি করা যায়?

রঘুনাথ হাসিয়া বলিল, আপাতত দুর্গা বলে উঠে পড়। জ্যান্ত বা মরা— বুঝতে পারলে না? চল—

শ্যামকান্ত বিনা ভূমিকায় বলিল, জমিদারি এবার থেকে আমি দেখছি। বাবা আর কত খাটবেন—আমার উপর ভার পড়েছে। চাকরি নিতে হলে আমার খোশামোদ করতে হবে।

মালাধর সবিনয়ে বলিল, যে আজ্ঞে।

তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি কেন, বুঝেছ?

মালাধর একগাল হাসিয়া বলিল, বুঝেছি কতক কতক। চাকরি দেবেন বোধ হয়।

শ্যামকান্ত কহিল, না—মুণ্ডপাত করব। সৌদামিনী ঠাকরুন মামলা রুজু করেছেন—চক বেদখলের মামলা। সমস্ত তোমার কারসাজি।

মালাধর জিভ কাটিয়া ঘাড় নাড়িয়া মহা প্রতিবাদ করিতে লাগিল। কক্ষণো না, একেবারেই না। আমার গরজটা কি মশাই? বিষয় আপনাদের যার হয় হোকগে, আমার সেহা-করচা নিয়ে সম্পর্ক। যোলআনা হিস্তার মালিক সৌদামিনী দেব্যা না লিখে নরহরি চৌধুরি লিখতে আমার আর কি এমন বেশি খাটনি, বলুন।

তবে বরণডাঙার হয়ে এত কাণ্ড করলে কেন?

মালাধর বলিল, বরণডাঙা? আমার বয়ে গেছে। চৌধুরি মশায়ের সঙ্গেই তো কথাবার্তা চলছিল—হরিচরণ চাটুজ্জে মধ্যবর্তী। চাটুজ্জে রাঘব-বোয়াল মশাই, সমুদ্দুর শুষে নেয়। পান খাবার খরচা-টরচা কি আদায় করল—ভাগের বেলা

একেবারে তাইরে-নাইরে-না। তখন মনে ভাবলাম, দুত্তোর—পুরোণো মনিবকে কিছু পাইয়ে দি এই ফাঁকে—ধর্ম হবে। নুন খাই যার, গুণ গাই তার। তা হয়েছে মশাই, ভালই হয়েছে। প্রায় দুনোদুনি দর। লোনা-ওঠা চর—মেয়েমানুষ ছাড়া কে নিত অত টাকা দিয়ে? মনিব মশায় রেজেস্ট্রি-অফিস থেকে টাকা বাজিয়ে নিয়ে সোজা বরিশালের স্টিমারে উঠে বসলেন।

শ্যামকান্ত হাসিয়া বলিল, আর তুমি এলে বুঝি নিরম্বু একাদশী করে?

মালাধর ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, ঐ তো ভুল করছেন বড়বাবু। চৌধুরি মশাই ঐ ভুল করলেন বলে তো এত গণ্ডগোল। বলি, চাকর-মনিব কি আলাদা? আমার সাবেক মনিব মশায় জানতেন সব। আট টাকা মাইনে মশায়, রাত-দিনের চাকরি, খোরাকি ওরই মধ্যে। তা-ও আজ আড়াই বছর মাইনে বাকি। মনিব কি ভাবতেন, আমি বাতাস খেয়ে আছি?

শ্যামকান্ত হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, চকের দলিলের নকল আছে তোমার কাছে, সেইটে আমি দেখব।

মালাধর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আজ্ঞে না—নেই।

শ্যামকান্ত বলিল, কসবায় গিয়ে খোঁজাখুঁজি করবার সময় নেই আর। বুধবারে মোকর্দমার দিন। দলিল না দেখালে তোমার গলা কাটব।

মালাধর বলিল, দলিল কি গলার ভিতর রয়েছে বাবু?

শ্যামকান্ত হাসিয়া ফেলিল। না থাকে, সিন্দুকের ভিতর আছে। সিন্দুক খুলবার মন্তোর আমি জানি। বাবা যে ভুল করেছেন, আমার বেলা তা হবে না। দাঁড়িয়ে রইলে কেন মালাধর, বোসো—বোসো ফরাসের উপর। রঘুনাথ, দেওয়ানজির সেরেস্তা থেকে জেনে এস, বুধবারেই মোকর্দমার দিন তো?

শ্যামকান্তর মন্ত্রটা কি প্রকার কে জানে, কিন্তু ফল তার হাতে হাতে। পুনরায় ডাকাডাকির আর আবশ্যক হইল না। মালাধর সন্ধ্যার পর আবার

ক্রোশখানেক হাঁটিয়া সৌদামিনীর সেই দলিলের নকল চাদরে বাঁধিয়া লইয়া আঁধারে আঁধারে শ্যামকান্তের বৈঠকখানায় আসিয়া উঠিল।

শ্যামকান্ত হাসিয়া বলিল, এইটে তো সেই? তোমায় বাপু কিছু বিশ্বাস নেই।

প্রদীপের আলোয় শ্যামকান্ত মনে মনে পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। বলিল, জবর দলিল তো! বাঁধন-কষনের বাকি নেই কিছু। তবে আর অনর্থক মামলা করে কি হবে?

মালাধর কৃতার্থ হইয়া যেন গলিয়া পড়িবার জো হইল। বলিল, আজ্ঞে, আমার কাজকর্ম এই রকম। খুঁৎ পাবেন না। চাকরিটা দিন, দেখতে, পাবেন তখন।

বিরক্ত মুখে শ্যামকান্ত বলিল, চক পেলে তো চাকরি? যত-কিছু উৎপাত আসতে পারে, একটা একটা করে সব তো দলিলে ঢুকিয়ে বেঁধে ফেলেছ। মাথা ঢোকাবার একটু ফাঁক নেই—

মালাধর হাসিয়া বসিল, নেই—কিন্তু হতে কতক্ষণ? হুজুর যদি ইচ্ছে করেন, মাথা তো মাথা, হাতী ঢুকিয়ে দিতে পারি ওর মধ্যে। আসলে হল, হুজুরের ইচ্ছে। বলিয়া আঙুলে কাল্পনিক টাকা বাজাইয়া মালাধর হাসিয়া ফেলিল। বলিল, হুজুর, কথাবার্তাটা এবার আগে থাকতে আস্কারা হয়ে যায় যেন। সেবারের যত গোলমাল, সমস্ত ঐ দোষে। আরে বাবু, গণেশ-পূজো না হলে মা-দুর্গা ভোগ কি নেন কখনো? হল না তাই।

(২২)

সমন লইয়া আদালতের পেয়াদা দেখা দিল।

মালাধর পড়িয়া যাইতেছিল, বাদী শ্রীমত্যা সৌদামিনী ঘোষ, জওজে মৃত শিবনারায়ণ ঘোষ, জাতি কায়স্থ, পেশা—

দেখি—বলিয়া নরহরি তার হাত হইতে কাগজটা টানিয়া লইয়া টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

মালাধর কহিল, শেষকালে ঐ যে লিখেছে, বুধবারে অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া—মোটের উপর তারিখটা যেন ঠিক থাকে হুজুর।

চৌধুরি মালাধরের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিলেন। সে দৃষ্টির সম্মুখে মালাধর সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বলিল, মানে, ফৌজদারি মামলা কি না—অন্তর্জলী থেকে আসামি টেনে তুলে নিয়ে যায়। তাইতে বলছিলাম। তা দেখুন না হয় একবার যুক্তি-পরামর্শ করে—

হঠাৎ নরহরি হাসিয়া উঠিলেন। নীরস ভয়ানক হাসি, অন্তরের মধ্য অবধি কাঁপিয়া উঠে। বলিলেন, শ্যামগঞ্জের চৌধুরিরা কোন্ পুরুষে কবে কাঠগড়ায় উঠেছে মালাধর, যে মামলার তারিখ মনে করিয়ে দিচ্ছ? মরদে মরদে বিবাদ, লাঠিতে লাঠিতে তার মীমাংসা—আইন-আদালত করবে কি?

নিশ্বাস ফেলিয়া এক মুহূর্ত তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর বলিতে লাগিলেন, তবে কি না এবার মাঝে মেয়েমানুষ এসেছে। বরণডাঙার গিন্নি কসবায় গিয়ে এমন করে মাথা মুড়োবেন, কে জানত? হাকিমের কাছে না কেঁদে আমার কাছে কাঁদলে দিতাম এ সমস্ত ছেড়েছুড়ে—

চৌধুরি গম্ভীরভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন। মালাধর শ্যামকান্তর বৈঠকখানায় ঢুকিয়া গেল। অনেকক্ষণ এমনি কাটিল। শেষে নরহরি ডাকিলেন, রঘুনাথ!

রঘুনাথ আসিলে বলিলেন, চল ঘুরে আসি। দু-জনে অনেক দিন পরে পাল্লা দিয়ে আজ ঘোড়া ছোটানো যাবে।

সর্দার ও মনিব মালঞ্চের কূলে কূলে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। বালুকায়

ঘোড়ার খুরের শব্দ হইতেছে না। অনেক রাত্রি, চারিদিকে অতল নিস্তব্ধতা। তেঘরার বাঁকে জল নাই মোটে। নদীজলে ঘোড়া নামাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে তাঁরা পার হইয়া উঠিলেন।

গভীর রাত্রে কেউ মালঞ্চের রূপ দেখিয়াছ ?

ভাঁটার টান শেষ হইয়া ঘোলা জল থমকিয়া দাঁড়ায়, জেলেরা জাল তুলিয়া লণ্ঠনের আলোয় বাঁধের পথে ঘরে ফিরে, আবছা অন্ধকারে আকাশ-ভরা তারা ঝিকমিক করে। ওপারে নির্জন নিঃশব্দ দিগন্তবিসারী মাঠ, এপারে ঢালিপাড়ার শত শত খোড়োঘর, বাবলা-বন। ঠিক এই সময়টা শ্রান্ত অবসন্ন নদী শিথিল দেহ এলাইয়া যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। খড়ের নৌকা, ধানের নৌকা, পূবদেশি ব্যাপারির লঙ্কা-হলুদের নৌকা সমস্ত সারি সারি নোঙর ফেলিয়া বালুতটে মাথা রাখিয়া ঘুমায়। দিনের আলোয় যে মরদগুলার লম্বা পাকা লাঠি আর চিতানো চওড়া বুক দেখিয়া চমকিয়া ওঠ, রাতের নক্ষত্রালোকে মাটির দাওয়ায় কাঠির মাদুরের উপর অসহায়ের মতো তারাও পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়। হয়তো হঠাৎ অনেক দূর হইতে অস্পষ্ট একটা কুকুরের ডাক আসে, শোঁ করিয়া আকাশে একটা উল্কা ছুটিয়া যায়, এক ঝলক শীতল নৈশ বাতাস ঘুমের মধ্যে একবার বা পাশ-মোড়া দিয়া জাগিয়া ওঠে। হাওয়ায় হাওয়ায় জলতরঙ্গে সেই অপরূপ নির্জনতায় রূপসী মালঞ্চের এলানো আঁচল, গায়ের কত গহনা ঝলমল করিয়া ওঠে!

এত পথ দু-জনে চলিয়া আসিলেন, ভাল-মন্দ একটি কথা নাই। যেখান-হইতে নরহরি ঘোড়ায় চাপিয়াছিলেন, চাতালের নিকট সেইখানটিতে আসিয়া তিনি লাফাইয়া নামিলেন। পুরাণো দুর্গের মতো বিশাল প্রাসাদ অন্ধকারে ডুবিয়া আছে; রঘুনাথ ঘোড়া দু'টি আস্তাবলে লইয়া গেল। উঠানে ঢুকিয়া নরহরি দেখিলেন, শ্যামকান্তের বৈঠকখানায় আলো। অত বড় মহলের মধ্যে কেবল শ্যামকান্ত ও মালাধর জাগিয়া থাকিয়া কি পরামর্শে মাতিয়া আছে। মালাধরের এখন আর বাড়ি হইতে আসা-যাওয়া করিতে হয় না; এখানেই থাকে,

বৈঠকখানার পাশে ঘরটা শ্যামকান্ত তাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। নরহরি ধীরে ধীরে সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। গম্ভীর স্বরে কহিলেন, কসবায় গিয়েছিলাম—

পরামর্শ বন্ধ হইয়া গেল, দু-জনেই তাঁর মুখের দিকে চাহিল। নরহরি বলিতে লাগিলেন, কিছুতে বিশ্বাস হচ্ছিল না—শিবনারায়ণের বউ সত্যি সত্যি গিয়াছে মামলা করতে। একি একটা বিশ্বাস হবার কথা? অথচ সমন দেখে অবিশ্বাসই বা করি কি করে? তাই গেলাম ভাল করে খবরটা নিতে। শশিশেখর উকিলকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি কাণ্ড বাপু? সে বলল, দেওয়ানি-ফৌজদারি আজকাল কোন জমিদারের ঘরে বিশ-পঁচিশ নম্বর না আছে? ওতে আর ভয়টা কি।

বলিয়া নরহরি একটু হাসিলেন। বলিতে লাগিলেন, শশিশেখর অভয় দিল, তবু ভয় আমার এত হয়েছে—সমস্তটা পথ কেবল ভাবতে ভাবতে এসেছি ঐ সমস্ত করে এখন থেকে বিষয় রাখতে হবে নাকি?

মালাধর বলিল, কোন ভাবনা নেই। আমরাই বা পিছপাও কিসে? বড়বাবুকে বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করে দেখুন।

সে কথা কানে না লইয়া নরহরি বলিতে লাগিলেন, বরণডাঙার গিন্নি যা করছেন, ঐ চলবে এখন দেশের মধ্যে। পুরুষ-জোয়ান নেই আর, সমস্ত মেয়ে-রাজ্য। আমি আর করব কি—সত্যিই আমার ছুটি। যা করতে হয়, তুমি কর শ্যামকান্ত। আমি মামলা-মোকর্দমা করে বেড়াতে পারব না—বুঝিও না।

মালাধর তৎক্ষণাৎ বলিল, বেশ তো হুজুর, আমরাই করব। ঢুই তুড়ি দিয়ে মামলা জিতে আসব। নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি। হেঁ হেঁ—পনের আনা তদ্বির এরই মধ্যে সারা হয়ে গেছে।

শ্যামকান্ত ঘাড় নাড়ি নাড়িয়া সায় দিল। তা ঠিক। বড্ড কাজের লোক এই মালাধর! ওকে পেয়ে খুব কাজ হল। মামলার জন্যে ভয় নেই বাবা।

নরহরি মুখে হাসি ফুটিল। বলিলেন, ভয়? ভয়ই সত্যি। কিন্তু

আসল ভয়টা হচ্ছে, আমি বুড়ো হয়ে গেছি—তোমাদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছি নে।

তারপর পুরানো স্মৃতির ভারে নরহরির কণ্ঠস্বর যেন অবসন্ন হইয়া আসিল। বলিতে লাগিলেন, শিবনারায়ণের বউ গেল কসবায় নাকে কাঁদতে। বাঘের ঘরণীর এই দশা—কিসে আর সাহস থাকে বল। শিবনারায়ণের বিদ্যের কাছে নবদ্বীপের বামুনদের অবধি মাথা হেঁট হয়ে যেত। আর কি লাঠিই ধরত! লাঠির লোভ দেখিয়ে চিন্তামণি-ওস্তাদকে কেড়ে নিয়ে গেল। প্রথম যেদিন দেখা হয়, এমন মার মেরেছিল—কবজির উপর আজও এই দাগ রয়ে গেছে। বলিয়া একটি স্বল্পাবশেষ আঘাত-চিহ্নের উপর সগর্বে তিনি আঙুল রাখিলেন।

শ্যামকান্ত বলিব, অনেক রাত হয়ে গেছে বাবা, আপনি এখন বিশ্রাম করুন গে।

নরহরি বলিলেন, হাঁ, যাই। পুরোপুরি বিশ্রাম এবার। আমি কিছুতে বুঝতে পারছি না শ্যামকান্ত, এখনও চিন্তামণি-ওস্তাদ বর্তমান রয়েছে, অথচ জমাজমির হাঙ্গামায় বরণডাঙার বাড়ি থেকে লাঠি বেরুল না, বেরুল একরাশ কাগজপত্তোর। তাই তো বলি, আমরা সেকেলে মানুষ—বিদ্যে তো আঁকুড়ে ক আর বকঠুঁটো খ—ঐসব কাগজপত্তোরের আমরা বুঝি কি? তুমি বিদ্বান হয়ে এসেছ, ও-সব তোমাদের পোষায়। এই কথাটাই তোমাকে বলতে এলাম।

বলিয়া হাসির শব্দে চতুর্দিক সচকিত করিয়া নরহরি বাহির হইয়া গেলেন।

পাশের ঘরে সকলে অঘোরে ঘুমাইতেছে, নিশ্বাসের গভীর শব্দ আসিতেছে। নরহরির কিন্তু ঘুম নাই। শিয়রের দেয়ালে আংটার উপর সযত্নে লাঠি রাখা আছে। এ লাঠির ব্যবহার এখন একেবারে বন্ধ হইয়া যাইতেছে,

পঞ্চাশ বছর আগে কিশোর বয়সে প্রথম তিনি এই লাঠি ধরিয়াছিলেন। লাঠির মাথায় পেঁচানো সোনার সাপ, সাপের দুই চোখে দু'টি লাল পাথর। নরহরি ঘুমাইয়া পড়িলে যৌবনের সাথী লাঠিখানা এখনও পাথরের চোখ মেলিয়া পাহারা দিয়া থাকে। নির্জন কক্ষে লাঠিয়ালের সঙ্গে লাঠি কথা বলে। আজ রাত্রে বাদাম-বনে কুয়োপাখী ক্রমাগত ডাকিতেছে, ডাকাতের বিল ভরিয়া অজস্র জোনাকি—যেন আকাশের সমস্ত তারা ভাঙিয়া খসিয়া ধূলার মতো হইয়া উড়িতেছে, যেন মাঠের মধ্যে শত শত দীপ জ্বালিয়া বড় ধুম করিয়া কাদের বিয়ে হইতেছে। নরহরির কি হইল—অনেক দিনের পর লাঠিটা নামাইয়া মুঠা করিয়া ধরিয়া শয্যার উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিশোর কালে এমনি করিয়া লাঠি ধরিতে বুক ফুলিয়া উঠিত। অভ্যাসের বশে এখন আর সে উত্তেজনা নাই, লাঠির পরে সে ভালবাসা নাই, লাঠি যেন নরহরির মুখোমুখি চাহিয়া সেই সব দিনের জন্য কত দুঃখ করিতে লাগিল।

ও-ঘরে হঠাৎ স্বর্ণলতা ধড়মড় করিয়া ঘুম হইতে জাগিয়া বসিল। বোধকরি কোন স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবে। সভয়কণ্ঠে ঝিকে ডাকিতে লাগিল, হাবির মা, হাবির মা গো—

নরহরি ডাকিলেন, এস মা, তুমি এ-ঘরে চলে এস।

বাপের আদরে ঘুম-চোখে স্বর্ণ ছুটিয়া আসিল। আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। এত রাত্রে বাপের হাতে লাঠি! স্বর্ণ চমকিয়া উঠিল।

লাঠি কি হবে বাবা?

কি হবে ভাবছি তো তাই। ফেলে দেব।

স্বর্ণ বলিল, আমি নেব।

নিবি তুই? নিবি? তারপর অসহায়ের মতো কণ্ঠে নরহরি বলিলেন, যার নেবার কথা, সে নিল না। ওরা নেবেও না কোনদিন।...স্বর্ণ, তুই লাঠি শিখবি?

সুবর্ণলতা আনন্দ আর ধরিয়া রাখিতে পারে না। বলিল, হ্যাঁ বাবা। তুমি আমাকে শিখিয়ে দেবে। দিনে না পার, রাতে শিখিও। বড় আলোটা জেলে দিয়ে শিখব—আমি ঘুমুব না।

নরহরি বলিলেন, না মা, দিনমানেই শিখো তুমি—সমস্ত দিন ধরে আমি তোমাকে লাঠি শেখাব। এবার আমার ছুটি হয়ে যাচ্ছে।

মেয়েকে পাশে বসাইয়া নরহরি তার মাথার উপর হাত রাখিলেন।

(২৩)

সুবর্ণের আজকাল মাটিতে পা পড়ে না। পড়িবার কথাও নয়, সে দশের বাড়ি অবধি শিখিয়া ফেলিয়াছে। লাঠি হাতে একবার সোজা হইয়া দাঁড়ায়, একবার বা হাঁটু গাড়িয়া বসে, কখনও মাটিতে শুইয়া পড়ে। ভাবখানা, যেন সামনে তার শ' দুই-তিন লোক, আর সে একলা অত লোকের মহড়া লইতে লাগিয়াছে। নরহরি টিপিটিপি হাসেন।

ওদিকে বাপের কাঁধের বোঝা শ্যামকান্ত সর্বান্তঃকরণেই লইয়াছে। দিনরাত যুক্তি-পরামর্শ, লোকজন ডাকাডাকি। মালাধর তো ভোরবেলা হইতেই কুড়িখানেক মানুষ লইয়া সাক্ষির তালিম দিতে বসিয়া যায়। দু-একদিন অন্তর কসবায় গতায়াত চলিতেছে। এমনি সময়ে একদিন শ্যামকান্ত মালাধরের সঙ্গে নরহরির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, নানা রকম ছল-ছুতো করে অনেক দিন কাটান গেল। এবারে হাকিম আর শুনবে না। পরশু মোকর্দমা।

নরহরি বলিলেন, আমি তা শুনে কি করব ?

শ্যামকান্ত বলিল, আপনি আপনার ঘোড়ায় যাবেন। শেষরাতে রওনা হলে আদালত বসবার মুখেই পৌঁছে যাবেন। আমরা কাল সকালে আগে-ভাগে পানসিতে রওনা হব।

নরহরি বলিলেন, মামলা-মোকর্দমা আমি তো বুঝি নে। আমি গিয়ে করব কি ?

মালাধর সামনে চলিয়া আসিল। হাত-মুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিল, বুঝতে হবে না কিছু। বুঝবার কিছু কি বাকি রেখেছি আমরা ? সমস্ত ঠিকঠাক। আপনি খালি বলে আসবেন, বউভাসির চক বলে কথিত সম্পত্তিতে আপনি বিশ বছরের দখলিকার। ব্যস !

নরহরি বলিলেন, বললেই অমনি হয়ে যাবে ?

মালাধর সগর্বে শ্যামকান্তর দিকে চাহিল। বলিল, তা হবে কেন ? আরো কত পাকা দলিল-দস্তাবেজ রয়েছে ! অত বড় পানসি তবে ভাড়া হচ্ছে কি জন্যে ?

দলিলের সিন্দুকসুদ্ধ নিয়ে যাবে নাকি ?

মালাধর হাসিয়া বলিল, সিন্দুকে আর ক'টা দলিল আছে চৌধুরি মশাই ? বেশির ভাগ তো এখনও চালের কলসিতে। নরহরির বিস্ময়ের ভাব দেখিয়া বলিতে লাগিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। কলসির ভিতর সব পড়ে পড়ে পুরাণো হচ্ছে। শ্যামশরণের আমলেরও রয়েছে—আজকের নয়। জমাখরচ সেহা করচা—সমস্ত। বেরুক আগে, দেখবেন তখন। কারো বাপের সাধ্যি হবে না যে বলে, ওসব আপনার গোলাম এই অধমাধম মালাধর সেনের কারুকার্য। বলিয়া নিজের চতুরতায় মালাধর হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

হাসি থামিয়া গেল নরহরির কথায়। শ্যামকান্তকে লক্ষ্য করিয়া নরহরি গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, আমার কোন পুরুষে কেউ কাঠগড়ায় ওঠেন নি, আমিও উঠব না। আমার ছুটি। যা করতে হয়, তোমরা কর গিয়ে। এতখানি করে ফেলেছ, আর বাকিটুকু পারবে না ?

শ্যামকান্ত বলিল, তা যদি হত, মিছামিছি আপনাকে কষ্ট দেব কেন বলুন ? আপনার নামে বিষয়, মোকর্দমাও আপনার নামে—একটা বার শুধু হাকিমকে দেখা দিয়ে আসতে হবে। তারপর অতিশয় ব্যাকুলভাবে বলিতে লাগিল,

আমরা অনেক খেটেছি, সমস্ত একেবারে অনর্থক হয়ে যাবে। আর এটায় গোলমাল বেরুলে—বলা তো যায় না, ফৌজদারিতে যদি জেলের হুকুম-টুকুম হয়ে বসে, তাতেও মুখ উজ্জ্বল হবে না বাবা। এবারটা আপনাকে যেতেই হবে।

মালাধরও বলিল, কোন গোলমাল নেই চৌধুরি মশাই। এজলাসে গিয়ে হলফ পড়ে ক'টা মাত্র কথা বলেই খালাস। তার পরে আমরা তো রইলাম—

শেষ পর্যন্ত কিন্তু গোলমাল বেশ জমিয়া উঠিল।

নরহরি কাঠগড়ায় উঠিয়া কথা কয়টি নির্ভুল ভাবেই বলিলেন, বউভাসি নামক একটি চক সৌদামিনী কিনিয়াছেন বটে, কিন্তু জমি তাহাতে মাত্র দুই-তিন শ' বিঘা। চকের উত্তর সীমায় নরহরির চক। সেই চকের জমি অন্যায়ভাবে গ্রাস করিবার চেষ্টা হইতেছে। নরহরির প্রজাপাটক ঐ সব জমি বরাবর চাষ করিয়া থাকে—এ কেবল এবারের একটি দিনের ঘটনা নহে। কিন্তু মিথ্যা মামলার সৃষ্টি করিয়া চৌধুরিকে নাস্তানাবুদ করা এই প্রথম।

প্রমাণ ?

প্রমাণের অভাব নাই কিছু। কমপক্ষে ঝুড়িখানেক কাগজপত্র দাখিল হইয়াছে। কতকগুলি তার অতি-পুরাণো সেকেলে অদ্ভুত ছাঁদে লেখা, পোকায় কাটা। আবার পাল্টা জবাবে বরণডাঙা তরফ হইতে যাহা সব বাহির হইতে লাগিল, তাহাতেও আতঙ্ক লাগে। হাজার দলিলের হাজার রকম মর্ম গ্রহণ করিতে করিতে টানাপাখার নিচে বসিয়াও হাকিম গলদঘর্ম হইয়া উঠিলেন।

কাগজের স্তূপ উল্টাইতে উল্টাইতে বরণডাঙা-পক্ষের পরেশ উকিল নরহরিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, বাপরে বাপ! আয়োজন সামান্য নয়। একেবারে বিশ বছরের দাখলে সংগ্রহ। একখানা হারায় নি, নষ্ট হয় নি। কিন্তু এত দাখলে লেখা হল কোথায়, তাই কেবল ভাবছি।

মালাধর নরহরির পিছনে দাঁড়াইয়াছিল। ফিসফিস করিয়া সে সমঝাইয়া

দিল, মস্ত বড় কাছারি রয়েছে আমাদের। আটচালা ঘর—দেউড়ি সমেত। সেখানেই আদায়পত্তোর হয়, দাখলে লেখা হয়—

নরহরি কহিলেন, ভেবে কিনারা করতে পারলেন না উকিল বাবু? দাখলে লেখা হয়ে থাকে পাটের আড়তে।

উকিল মৃদু হাসিয়া বলিল, পাটের আড়তে নয়, পাটোয়ারির ঘরে। সে আমি জানি।

নরহরি কহিলেন, তা যদি বলেন, আমার কাছারি-ঘরটা তবে একদিন দয়া করে দেখে আসবেন মশাই।

উকিল কহিল, আমি কেন—যাঁরা দেখবার তাঁরাই গিয়ে দেখে আসবেন। ঘরটা শক্ত করে বাঁধবেন—দেখবার আগেই যেন উড়ে না পালায়।

সৌদামিনীর উকিল পুরা দুইদিন এমনি কত কি জেরা করিল, পনের-কুড়িটা সাক্ষিরও তলব হইল; কিন্তু মীমাংসা কিছুই হয় না, সমস্যা আরও সঙ্গিন হইয়া ওঠে।

হাকিম রাগ করিয়া কলম ছুঁড়িয়া বসিয়া রহিলেন। শেষে সরেজমিন তদন্তের হুকুম হইল। বিচার স্থগিত রহিল।

বাহিরে আসিয়া মালাধর হাসিয়া খুন। বলে, রসগোল্লা খাওয়ান বড়বাবু। জয় নির্ঘাৎ। গোটা ঢালিপাড়া প্রজা হয়ে এসেছে, পানসির খোল বোঝাই দলিল-দস্তাবেজ—তার উপর কাছারি-বাড়ি, নায়েব-গোমস্তা···আর চৌধুরি মশাই যা বলা বলে এলেন—

শ্যামকান্ত বলিল, রোসো—তদন্তটা হয়ে যাক আগে। কোন বেটা যাবে, সে আবার কি করে আসে—

মালাধর বলিল, ফৌজদারি তো ফেঁসে গেল। এখন সত্ত্বাসত্ত্বির কথা। দেওয়ানি মামলা মশাই, যার নাম হল দেও আনি'—যা কিছু আছে, সব এনে এনে দিয়ে যাও। ব্যস্! তদন্ত এখন গড়াতে গড়াতে ছ-মাসের ধাক্কা। দুটো

মাস সময় দিন আমাকে—কি কাছারি-বাড়ি করে দেব দেখবেন। তুটো মাসের মাত্র সময় চাই।

কিন্তু স্বপ্নেও যাহা আন্দাজ হয় নাই, তাহাই ঘটিল। আদালতের আদিকাল হইতে এমন অসম্ভব কাণ্ড বোধকরি কখন হয় নাই। ঐ শ্যামগঞ্জ-বরণডাঙা অঞ্চলটাতে জমাজমি-ঘটিত আরো কয়টা তদন্ত ছিল। ডেপুটি যাওয়ার ঠিক হইয়াই ছিল। তাঁর সেই তালিকার মধ্যে বউভাসিটাও জুড়িয়া দেওয়া হইল। ঢালিপাড়ার যারা সাক্ষি হইয়া আসিয়াছিল, তারা সব বাড়ি ফিরিয়া গিয়াছে। কেবল পরবর্তী আর কয়েকটি কাজকর্মের দরুন এবং শশিশেখর একটু ছোট-খাট ভোজের আয়োজন করিয়াছে—সেইজন্য নরহরিরা যান নাই। রঘুনাথ ঘোড়া লইয়া চলিয়া গেছে, ভোররাত্রে পানসিতে ইঁহারা একত্র হইয়া রওনা হইবেন, এইরূপ ঠিক আছে। বিকালে অকস্মাৎ শশিশেখর জরুরি খবর পাইল, ডেপুটি বউভাসির চকের তদন্ত করিতে পরের দিনই পৌঁছিয়া যাইবেন।

শ্যামকান্ত মাথায় হাত দিয়া বসিল। এখন উপায়? তদন্তের তারিখ একটা সপ্তাহও পিছাইয়া দেওয়া যায় না?

শশিশেখর কহিল, বউভাসি পথেই পড়ে গেল কিনা! ঐটে সেরে তারপর অন্যান্য জায়গায় যাবেন। ও আর ঠেকাবার উপায় নেই। এখনো বেলা আছে, চলে যান—কাছারি গিয়ে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে-গাছিয়ে ফেলুন গে—

নরহরি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, মালাধর রয়েছে—গুছোবার বাকি নেই কিছু। কাছারিরই কেবল অভাব। কিন্তু মালাধর, আমাকে এমন করে দাঁড় করিয়ে তোমরা মিথ্যেবাদী সাজালে? ঘোষগিন্নি এখনই হাসতে আরম্ভ করেছে, আমি টের পাচ্ছি।

খুব তাড়াতাড়ি ফিরিবার দরকার। আর পানসি নয়—তিনখানা পালকির বন্দোবস্ত হইল। নরহরি শ্যামকান্ত মালাধর—সকলেরই পালকি। হুমহাম করিয়া বিকালবেলা বেহারারা শ্যামগঞ্জের দিকে ছুটিল।

(২৪)

বর! বর!

ঠাহর করিয়া দেখিয়া ভানুচাঁদ বলিল, হ্যাঁ, বরই বটে! বরের পালকি, কনের পালকি—আর ঐ শেষের পালকি মেরে চলেছেন বোধ হয় ওদের পুরুত মশায়—

ঘাটে ছিল একখানা ডিঙি, সেইটাই ঠেলিয়া সে স্রোতে ভাসাইয়া দিল। ঝুপ-ঝাপ করিয়া তখন আরও আট-দশ জন জল ঝাঁপাইয়া আসিয়া ডিঙিতে চড়িয়া বসিল। অত লোকের ভারে ডিঙি জলের উপর আঙুল তিনেক মাত্র জাগিয়া আছে। একটু এপাশ-ওপাশ করিলেই জল ওঠে।

আকাশে চতুর্থীর ক্ষীণ চাঁদ। অনতিস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় রঘুনাথও ওপারের দিকে খানিকক্ষণ নজর করিয়া দেখিল। তারপর কহিল, বর না হাতী! না বাজনদার, না একটা বরযাত্রী···আরে একটা বোঠেও নিতে পারিস নি তোরা কেউ, হাত দিয়ে কাঁহাতক উজোন ঠেলে মরবি? বর—তা তোদের এত তাড়া কিসের? বরের তো মাথায় দুটো শিং বেরোয় নি?

ভানুচাঁদ মাঝ-নদী হইতে কহিল, বাজনা-টাজনা সব আগে ভাগে রওনা করে দিয়েছে। বোঠে খোঁজাখুঁজি করতে গেলে এরাও সরে পড়বে ততক্ষণে। চুপি চুপি চলেছে কেমন—বারোয়ারির চাঁদা-টাদা বলে পথে কিছু না দিতে হয়। মানুষ আজকাল কম শয়তান হয়ে উঠেছে!

কিন্তু আশ্চর্য, পালকি না পলাইয়া ওপারের খেয়াঘাটে বটতলায় নামিল। ক্রমশ দেখা গেল, তিনখানাই পাশাপাশি খেয়ার উপর উঠিয়াছে। ভানুচাঁদেরা

ডিঙি লইয়া আর আগাইল না। এপারেই আসিতেছে, তখন মোলাকাৎ তো নিশ্চয়ই হইয়া যাইবে।

খেয়া আগাইয়া আসিলে তাড়াতাড়ি পাশে ডিঙি লাগাইয়া দেখে, আগের বড় পালকির মধ্যে চৌধুরি মহাশয় চুপচাপ বসিয়া। চৈত্র-সন্ধ্যায় মৃদু মধুর হাওয়া দিতেছে। জ্যোৎস্না-ধূসর নদীজল ছল-ছল করিয়া নৌকার নিচে আহত হইতেছে, নৌকা নাগরদোলার মতো দুলিতেছে। ঢালিপাড়ার ঘাটে অনেক লোকের জটলা, তাদের প্রত্যেকটি কথাবার্তা বেশ স্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে। কিন্তু নরহরির লক্ষ্য কোনদিকে নাই, পালকির মধ্যে স্থাণুর মতো বসিয়া। ডিঙিটা আসিয়া খস করিয়া খেয়ানৌকার গায়ে তাঁহার ঠিক পাশে লাগিল, তাহাও বোধকরি টের পাইলেন না। পিছনে শ্যামকান্ত ও মালাধর বাহিরে নৌকার গলুয়ের দিকে কাছাকাছি বসিয়া ছিল। তাহারা ডিঙির দিকে একবার তাকাইয়া দেখিল, কিছু বলিল না।

খেয়া ঢালিপাড়ার ঘাটে গিয়া লাগিতেই কয়েক জনে কলরব করিয়া উঠিল।

কে? কে?

ভানুচাঁদ লাফাইয়া কূলে গিয়া নামিল। ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া সকলকে সে থামাইয়া দিল। ফিস-ফিস করিয়া বলিল, চুপ! চৌধুরি মশায়। অসুখ করেছে ওঁর।

সকলকে সরাইয়া রঘুনাথ আগে আসিয়া দাঁড়াইল। পালকি ঘাটের উপর নামাইতেই তাহাতে মুখ ঢুকাইয়া ব্যাকুল কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, খবর কি?

আর খবর! নরহরি খানিক ঠায় বসিয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া পালকি ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। কি যে বলিবেন, কি করিতে হইবে, কিছুই তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না।

চাঁদ অস্ত গিয়া ইতিমধ্যে চারিদিকে ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে নরহরির মুখের ভাবটা ঠিক ঠাহর হইল না বটে, কিন্তু দাঁড়াইবার সেই নির্বাক

ভঙ্গিতে রঘুনাথের বুকের মাঝখান অবধি মোচড় দিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, চৌধুরি মশায়, আমরা আছি কি করতে? বলুন কি করতে হবে?

কিছু না। বলিয়া নরহরি নিশ্বাস ফেলিলেন। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, শিবনারায়ণের বউ মেয়েমানুষ হয়েও এমন তদ্বির করে রেখেছে—কিচ্ছু আর করবার নেই সর্দার। পরের ভরসায় লড়তে গিয়ে আমার এই দশা।

সামনে অন্তত পঞ্চাশ জোড়া চোখ নিঃশব্দে জ্বলিতেছে। মুখ তুলিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া নরহরি বলিলেন, হাঁ—পরের ভরসা বই কি! লাঠি ছাড়া আর সব-কিছু আমার কাছে পর। আমায় ধরে নিয়ে গেল মামলা করতে। ওরা শিখিয়ে দিল, হলপ করে আদালতে বলে এলাম, আমরা চকের জমি বরাবর দখল করে আসছি—আমরাই আদায়-পত্তোর করছি—

ঢালির দল একসঙ্গে গর্জন করিয়া উঠিল, করছিই তো।

মৃদু হাসিয়া নরহরি বলিলেন, তা করছি। কিন্তু কাছারি অবধি নেই। অথচ বলে আসা হল, চরের উপর মস্ত কাছারি-বাড়ি—

নেই, তা হতে কতক্ষণ?

নরহরি কহিলেন, কাল সকালে তদন্তে আসবে—এই রাতটুকু পোহালেই।

শ্যামকান্ত ম্লানভাবে কহিল, তদন্ত অন্তত একটা হপ্তা সবুর করবার চেষ্টা করলাম—তা কিছুতে শুনল না।

রঘুনাথ পিছনে দলের দিকে একনজর তাকাইয়া বলিল, পুরো একটা রাত তো রয়েছে—কি বলিস তোরা? আচ্ছা চৌধুরি মশায়, আমরা চললাম।

তারা চলিল। পিছন হইতে নরহরি বলিতে লাগিলেন, অনেকদিনের কাছারি যে বাপু, রীতিমতো পুরোণো। ঝাড়ের টাটকা বাঁশের চাল, আর নতুন খড়ের ছাউনি হলে হবে না। অনর্থক খাটনি—ওসব করতে যাস নে তোরা।

বলিতে বলিতে হঠাৎ কিন্তু এত উদ্বেগের মধ্যেও নরহরি হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, মালাধর কাছারি পুরাণো করা যায় কেমন করে বলতে পার? দলিল-পত্তোর চালের কলসিতে রাখ, কাছারি-বাড়ি তো ঢুকবে না তোমার কলসির মধ্যে।

চলিতে চলিতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ঢালিরা নরহরির কথা শুনিল। মুখ ফিরাইয়া রঘুনাথ কহিল, চৌধুরি মশায়, মালাধর বলতে পারবে না, আমরা পারি—

নরহরি মুখ চাহিতে তার তীব্র চোখ তু'টার দিকে নজর পড়িল।

রঘুনাথ বলিতে লাগিল, ঐ যে গাবগাছের ধারে আটচালা ঘর দেখা যাচ্ছে—আমার ঠাকুরদাদা দক্ষিণের কারিগর এনে বড় শখ করে ও-ঘর তৈরি করেছিলেন। পলতোলা সুন্দরির খুঁটি, রঙ-করা সাজ-পত্তোর, সেকেলে কাজকর্ম—অমন আর হয় না আজকাল—

শ্যামকান্ত বলিল, সে সব শুনে আর লাভ কি হবে?

রঘুনাথ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, পাঁচ-শ' ভূতে ঐ ঘর কাঁধে নিয়ে রাত্রের মধ্যে চরের উপর বসিয়ে দিয়ে আসবে।

বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে নরহরি কহিলেন, তারপর?

ঘরের পুরাণো ছাউনি, চাই কি মেঝের উপর পুরাণো ভিটের মাটি আলগোছে বসিয়ে রেখে আসবে। হবে না তা হলে?

এতক্ষণে মালাধরের কথা ফুটিল। বলিল, হবে না কেন—খুব হবে। ফড়-ফড় করে তো বলে গেলে—সত্যি সত্যি পেরে উঠলে, নিশ্চয় হবে।

নরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তোমার কি হবে?

ভালই হবে। সহজ প্রশান্ত হাসি হাসিয়া রঘুনাথ বলিল, লাভ হবে আমার, পুরাণো দিয়ে নতুন পেয়ে যাব। আমার নতুন ঘর বানিয়ে দেবেন আপনারা।

শ্যামকান্ত তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সে তো দেবই, নিশ্চয় দেব। তা ছাড়া বথশিশ দেব খুব ভালো রকম—

(২৫)

তাজ্জব কাণ্ড! সকালে পথ-চলতি লোকেরা দেখিয়া অবাক হয়, কবে কখন এত সব ব্যাপার হইল? হঠাৎ বিশ্বাস হইতে চায় না—চক্ষু কচলাইয়া দেখিতে হয়, ব্যাপারটা স্বপ্ন কিনা। কাল দেখা গিয়াছে, দিগন্তবিসারী বালুক্ষেত্র—আজ সেখানে প্রকাণ্ড কাছারি-ঘর। চারিদিক ফিটফাট, মেজের আগাগোড়া সতরঞ্চি বিছানো, তার এক পাশে নিচু তক্তাপোষ, জাজিম পাতা—হাতবাক্স সেহা রোকড় খতিয়ান দাখিলার বহি···মালাধর এসব লইয়া মহাব্যস্ত। হুঁকাদানে সাজা-তামাক পুড়িয়া যাইতেছে, একটা টান দেওয়ার ফুরসৎ হইতেছে না। পৈঠার দক্ষিণে ডালপালা-মেলানো কামিনীফুলের গাছ।

নানা কথাবার্তা ও কাজকর্মে ঘর গমগম করিতে থাকে।

বড় জোর দুপুর নাগাদ হাকিম মহাশয় পৌঁছিয়া যাইবেন, এই প্রকার আন্দাজ ছিল। শ্যামকান্ত সেই দুপুর হইতে বসিয়া আছে। হাকিমের পৌঁছিতে কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া গেল। এবং সম্বর্ধনার প্রথম প্রস্থ শেষ হইতে রাত্রি এক প্রহর।

খুশিমুখে ডেপুটি বলিলেন, এ কি করেছেন শ্যামকান্ত বাবু? না না, এ ভারি অন্যায়। এত সবের কি দরকার ছিল বলুন তো!

কিছু না—কিছু না। শ্যামকান্ত বিনয়ে ঘাড় নাড়িল। বলিল, নানান অসুবিধে এ জায়গায়। মনে তো কত ইচ্ছে হয়, কিন্তু সে কি হবার জো আছে? মালাধর, আর দেরি কোরো না, কাগজপত্তোর বের করে ফেল—একটা একটা করে সমস্ত দেখিয়ে বুঝিয়ে দাও। আমি এখানে কিন্তু বেশি

রাত করতে দেব না হুজুর, তা আগে থাকতে বলে রাখছি। পালকি-বেহারা ঠিক রয়েছে, হুকুম হলেই নীলগঞ্জের ডাকবাংলায় পৌঁছে দিয়ে আসবে।

ডেপুটির মুখে হাসি ধরে না। বলিলেন, পালকিও রেখে দিয়েছেন নাকি? আপনার সকল দিকে লক্ষ্য শ্যামকান্ত বাবু। সত্যি বড় ভাবনা হয়েছিল, এই ঘুরকুট্টি অন্ধকার—ঘোড়ার পিঠে এই সময় অদ্দূর যাওয়া…আর রাস্তাঘাটের যা দশা দেখে এলাম—বড় মুশকিল হত তা হলে।

মালাধর কিন্তু কাগজপত্রে হাত না দিয়া অকস্মাৎ ত্রস্তভাবে উঠিয়া বরকন্দাজদের হাঁকাহাঁকি লাগাইল।

হল কি?

হুজুর এইবার কাজে বসবেন—এখনো মশালগুলো জ্বালাচ্ছে না। দেখুন দিকি বেটাদের কাজ।

কিন্তু কাজে বসিবেন কি, হুজুর অবাক হইয়া দেখিতেছেন, সমস্ত মাঠ আলো করিয়া একের পর এক বিশ-পঁচিশটা মশাল জ্বলিয়া উঠিল। আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, ব্যাপার কি শ্যামকান্ত বাবু?

নিতান্ত লজ্জিত হইয়া শ্যামকান্ত বলিতে লাগিল, ঐ যে বললাম একটু আগে, কাজকর্ম তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হবে। জায়গাটা বড্ড খারাপ। রাত্তিরে বাদার যত কেউটেসাপ উঠে এসে ঐ মেজের উপর, খাটের পায়ার কাছে, দেয়ালের উপর—সব জায়গায় কিলবিল করে বেড়ায়। সেবার হল কি—নিবারণ মুহুরি রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে ঢ্যাড়স কুটছে—ঝুড়ির মধ্যে মা-মনসা। তরকারি বের করতে গেছে, অমনি দিয়েছে ঠুকে। সে বিষ মোটে চিকিৎসা হল না। সাবধানের মার নেই—তাই ঐসব আলোর ব্যবস্থা করেছি। না না হুজুর, আপনি ব্যস্ত হবেন না—আলো দেখে ভয় পেয়ে সাপ বাদা থেকে না-ও উঠতে পারে।

হাকিম ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জুতার ফিতা বাঁধিতে লাগিয়াছেন। বলিলেন, পালকি ডাকুন। আজকে এসব থাক। কাল দিনমানে এসে তদারক করা যাবে।

মালাধর অতি সাবধানে আগে আগে আলো লইয়া চলিল। শ্যামকান্ত হাকিমকে বড় পালকিতে তুলিয়া নিজে ছোটটায় উঠিয়া বসিল। সে রাত্রি শ্যামকান্তও ডাকবাংলায় কাটাইল।

সকালবেলা মিনিট দশেকের মধ্যে তদন্ত হইয়া গেল। উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া সাক্ষ্য লইয়া ডেপুটি ঘোড়ায় উঠিতে যাইতেছেন, শ্যামকান্ত আসিয়া নিবেদন করিল, পালকি রয়েছে—আর একবার সরেজমিনে কাছারি-বাড়ির দিকে গেলে হত না?

হাকিম বলিলেন, কেন, তদন্ত কাল তো সেরে এসেছি।

নমস্কার করিয়া তিনি ঘোড়া ছুটাইলেন।

(২৬)

বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া কীর্তিনারায়ণের কানে অনেকগুলা ঢাকের আওয়াজ আসিতেছে। আওয়াজ স্পষ্ট নয়, ওপারে অনেক দূর হইতে আসিতেছে। খুশিতে মন ভরিয়া গেল, চড়ক আসিয়া গেল নাকি? সৌদামিনী একবার কি কাজে ঘরের ভিতর আসিলেন; তাঁকে জিজ্ঞাসা করিল, গাজনের বাজনার মতো লাগছে, হাজরাতলায় বাজাচ্ছে যেন—না?

ইহার জবাব না দিয়া সৌদামিনী ধমক দিলেন, রোদ চড়চড় করছে—এখনো শুয়ে পড়ে রয়েছ, ছিঃ!

কীর্তিনারায়ণ উঠিল কিনা, দেখিবার জন্য তা বলিয়া তিনি দাঁড়াইলেন না। যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনি বাহির হইয়া গেলেন। গম্ভীর বিষণ্ণ মুখ।

জানলার কাছে একটা নিমগাছের শাখাপ্রশাখা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। এক-

টুকরা ডাল ভাঙিয়া দাঁতন করিবে, কিন্তু হাত বাড়াইয়া বিস্তর চেষ্টা করিয়াও কীর্তিনারায়ণ নাগাল পাইল না। উঠানে নামিয়া গিয়া গাছে চড়িল। একেবারে মগডালে উঠিয়া বসিয়া বসিয়া সে দাঁতন করিতে লাগিল। দূরে—যেদিক দিয়া বাজনার শব্দ আসিতেছে, সেই দিকে নজর করিয়া দেখিবার চেষ্টা করে। হাজরাতলায় সত্যই কি যেন একটা ব্যাপার হইতেছে, বোঝা গেল। ঢালিপাড়ার মেয়ে-পুরুষ বহু লোক বাঁধের উপর দিয়া ঐদিকে যাইতেছে। মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল, চৈত্র-সংক্রান্তির অনেক দেরি, গাজনের বাজনা ইহা নয়।

নামিয়া সে চিন্তামণির খোঁজে গেল। খুঁজিতে খুঁজিতে দেউড়ি পার হইয়া নাটমণ্ডপের মধ্যে তাদের জন তিনেককে এক জায়গায় পাইল। কাঁধে লাঠি চুপি-চুপি কি বলাবলি করিতেছিল, কীর্তিনারায়ণকে দেখিয়া তারা চুপ করিল।

মুহূর্তকাল কীর্তিনারায়ণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। বসিবার জন্য কেহ না দিল একটা-কিছু আগাইয়া, না বলিল তাহার সঙ্গে কোন একটি কথা। ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে কীর্তিনারায়ণ বলিয়া উঠিল, কি হয়েছে বল তো ওস্তাদ-দাদা? মা কিচ্ছু বলে না, তোমরাও না—

চিন্তামণি ভারি গলায় বলিল, মামলা ডিসমিস হয়ে গেছে কর্তাভাই।

মামলায় হারিবার দুঃখ কীর্তিনারায়ণের বিশেষ উপলব্ধি হইল না, কিন্তু ওস্তাদের কণ্ঠে কান্নার আভাস তাহাকে আশ্চর্য করিয়া দিল। ব্যাপারটা ভালমতো না বুঝিয়া প্রশ্ন করিল, ডিসমিস হল কেন?

চৌধুরি আদালতে দাঁড়িয়ে ডাহা মিথ্যেকথা বলে এলেন বলে। ডাকাতি দাঙ্গাবাজি সে-ও যা হয় একরকম ছিল—বাঘা চৌধুরি বুড়োবয়সে লাঠি-সড়কি ছেড়ে পুরোপুরি পাটোয়ারি হয়ে বসলেন এবার।

ঘৃণায় চিন্তামণির কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে। বলিতে লাগিল, দেখ কি কর্তা-

ভাই, মালাধর সেন আর নরহরি চৌধুরিতে কিছু তফাৎ নেই। গিন্নি-ঠাকরুন অত টাকা দিয়ে চক খরিদ করলেন, সব ভুয়ো হয়ে গেল। আগে ছিল, জোর যার মুল্লুক তার—এখন লোকে জুয়াচুরি করে জমি চুরি করে, মিথ্যে দলিল বানিয়ে ধাপ্পা দেয়। ঝানু মানুষগুলোকে সনদ দিয়ে উকিল-মোক্তার বানিয়ে কোম্পানি বাহাদুর কসবায় বসিয়ে দিয়েছে, মিথ্যে বলবার জন্য তাদের ভাড়া করে লোকে মামলা চালায়।

ঢাক আবার জোরে বাজিয়া উঠিল। চিন্তামণি আর স্থির থাকিতে পারে না। মণ্ডপ হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল।

বাজনা কিসের ওস্তাদ-দাদা?

মামলায় জিতেছে, জাঁক করে তাই হাজরাতলায় পূজো দিচ্ছে। খুব ধুম-ধাড়াক্কা—তিন দিন ধরে খাওয়া-দাওয়া চলবে, শুনতে পেলাম।

অতিথিশালার সামনে অশ্বত্থতলায় চিন্তামণি আসিয়া দাঁড়াইল। ভক্ত বৈষ্ণব-সজ্জনেরা নয়—অনুগত লাঠিয়ালের দল এখন সেখানে থাকে। সকলে বাহির হইয়া আসিল।

খবর কি ওস্তাদ?

খাচ্ছিস-দাচ্ছিস, তোয়াজে রয়েছিস—খাজনা দিয়েছিস কখনো? মালেকের মাল-খাজনা আদায় করতে এসেছি আজ।

এই খাজনা-আদায়ের অর্থ সবাই জানে। তারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। একজনে বলিল, এদ্দিনে এই তো প্রথম ডাকলে ওস্তাদ। আর কখনো কেউ আসে নি। ভুলে বসে আছি যে নিষ্কর-লাখেরাজ খাচ্ছি নে—খাজনা দিতে হয়।

সৌদামিনির কাছে মরদেরা বিদায় লইতে গেল। চিঁড়া নারিকেল-সন্দেশ আর বাতাসা সৌদামিনী সকলের কোঁচড় ভরিয়া দিলেন। চিঁড়া খাইয়া ডাব খাইয়া মালকোঁচা আঁটিয়া প্রহরখানেক বেলায় তারা রওনা হইল। কীর্তিনারায়ণ

সে অঞ্চলেই নাই, কখন সরিয়া পড়িয়াছে। সমস্ত বাড়ি তন্নতন্ন করিয়া তাকে পাওয়া গেল না।

এমন একটা রোমাঞ্চক ব্যাপার এতকাল পরে ঘটিতে যাইতেছে, আর কীর্তিনারায়ণ কি চুপচাপ থাকিবে? ঘাটে এক জেলে-ডিঙি ছিল, কারো অপেক্ষা না রাখিয়া আগে ভাগে সে পারে চলিয়া গেল। পারে গিয়া ভাবিতেছে, চিন্তামণির দলবল লইয়া পৌছিতে অনেক এখনো দেরি আছে, খাল বাহিয়া ডাকাতের বিলের দিকেই আগাইয়া যাওয়া যাক না! বিলে নৌকা-ডোঙা চালাইবার যে দাড়া পড়িয়াছে তার দু-ধারে পদ্মফুল আর পদ্মের চাক তুলিবার নেশায় তাকে পাইয়া বসিল।

আপন মনে ফুল তুলিতেছে, আর সামনের যেখানটায় অনেক ফুটিয়া আছে লগি ঠেলিয়া সেদিকে আগাইতেছে। ডিঙির খোলে স্তূপীকৃত পদ্ম জমিয়া উঠিল। এক সময় খেয়াল হইল, একেবারে নাককাটির খালের মাথায় আসিয়া পড়িয়াছে, অনতিদূরে চৌধুরিদের রান্নাবাড়ি। ভিতর-বাড়িতেই বা বিজয়োৎসবের বহরটা কি—একটু জানিয়া লইবার ইচ্ছা হইল। সুবিধা আছে—কসাড় হোগলা-বন, বাদামের ডাল জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। ইহার ভিতরে ছোট্ট এই জেলে-ডিঙি কারও নজরে পড়িবার কথা নয়। এমন কি কূলে নামিয়া বাদামতলায় রান্নাঘরের ঘুলঘুলি দিয়া যদি এক নজর উঁকিঝুঁকিও দিয়া আসে, তাহা কেহ টের পাইবে না।

কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ, টের পাইয়া গেল সুবর্ণলতা। সকাল হইতে সুবর্ণর মন ভাল নাই, মামলায় জয়লাভের খবর শুনিয়া অবধি জেঠাই-মার কথা মনে পড়িয়া বড় কষ্ট হইতেছে। আজিকার এই অপমানের পর তাঁর মুখভাব আন্দাজ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কি করিতেছেন এখন তিনি? কীর্তিনারায়ণই বা কি করিতেছে? এখানকার এই পরিপূর্ণ সংসার ছাড়িয়া সেই যে চলিয়া গেলেন—

তারপর তাঁরা কি রকম আছেন, ইহাদের কথা বলাবলি করেন কি না, এই সব জানিতে বড় ইচ্ছা করে। স্বর্ণ এখন বাহিরের ব্যাপারও বুঝিতে শিখিয়াছে। তার বড় রাগ হয় শ্যামকান্ত ও মালাধরের উপর। লাঠি শেখানোর উপলক্ষে নরহরিকে কাছাকাছি পাইয়াছিল, বড় ভাল লাগিত ঐ সময়টা। নরহরি একেবারে শিশু হইয়া তার কাছে আসিতেন লাঠি-খেলার ব্যাপারে। কিন্তু মালাধর সেন আর তার দাদা যেন চক্রান্ত করিয়া বাপকে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্ধকার কুটিল পথে লইয়া চলিয়াছে। মামলা-মোকর্দমার তুমুল আয়োজনের মধ্যে লাঠি অবহেলিত হইয়া পড়িয়া আছে, নরহরিকে তাগাদা দিয়া দিয়া স্বর্ণ হয়রান হইয়া পড়িয়াছে। অভিমান করিয়া এখন আর কিছু বলে না।

হোগলাবন বিষম জোরে নড়িতেছে। হঠাৎ নজর পড়িয়া স্বর্ণলতা চমকিয়া উঠিল। এত অগভীর জলে কুমীর আসিবার কথা নয়। বাদামবনের ঘন পত্র-পুঞ্জের মধ্য দিয়া দৃষ্টি প্রাণপণে বিসারিত করিয়া রহিল। রোদ ঢুকিবার ফাঁক নাই, দিন দুপুরেই রহস্যাচ্ছন্ন দুপুর-রাত্রি বলিয়া মনে হয় নাককাটির খালের প্রান্তবর্তী এই বাদামবনে গিয়া দাঁড়াইলে। সত্য-মিথ্যা যে সব কাহিনী ডাকাতের বিল ও এই খালের সম্পর্কে প্রচলিত আছে, সমস্ত চকিতে স্বর্ণলতার মনের উপর দিয়া ভাসিয়া যায়। কে আসে—কবন্ধ ঘোড়-সওয়ার, শ্যামশরণ একদা যে অনুচরটির মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন অবাধ্যপনা করিয়াছিল বলিয়া? মুচে ভূত—খালের ধারে ধারে যারা নিচু হইয়া ভাগাড় হাতড়াইয়া বেড়ায়, মরা গরু-ছাগল কোথাও পড়িয়া আছে কিনা? কিম্বা সে আমলের ডাকাতের বিলের কোন ডাকাত-দল—যারা এখানে-ওখানে ঘাপটি মারিয়া থাকিত, সুযোগ বুঝিলে তে-রে-রে-রে করিয়া আসিত?

ভাল করিয়া দেখিবার জন্য স্বর্ণলতা নিচে নামিয়া গেল।

মেঘ করিয়াছে। মেঘের আবরণে রোদ স্পষ্ট হইয়া ফুটে নাই। অন্যমনস্ক

ভাবে নরহরি মুক্ত অলিন্দে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছেন। মাঝে মাঝে মেঘমুক্ত এক ঝলক রোদ পড়িয়া রূপার পাতের মতো মালঞ্চের সুবিস্তৃত জলধারা ঝিকমিক করিয়া উঠিতেছে। চিতলমারি খালের দিকে চাহিয়া নরহরি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। মোহানার প্রান্ত হইতে চর দীর্ঘতর হইয়া খালের ভিতর অনেক দূর অবধি পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, চিতলমারি মজিয়া আসিতেছে। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজের দিকে একবার চাহিলেন। কপালের দু-দিক দিয়া টাক মস্তিষ্ক অবধি অগ্রসর হইয়াছে, সমস্ত মুখে বলিরেখা অবোধ্য অক্ষরে জীবনের কত কি বিচিত্র কথা যেন লিখিয়া দিয়াছে। তাঁদের দিন বিগত হইয়া আসিল। একদা মালঞ্চের উপর কোলাকুলি করিয়া যাহাদের বন্ধুত্ব মনে প্রাণে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, তারা আজ পরম শত্রু। কিন্তু মনিব সাজিয়া যে বাড়িতে তিনি বর্তমান আছেন, তাদের সঙ্গেই বা তাঁর সংযোগ ও হৃদ্যতা কতটুকু ?

স্বর্ণলতা ছুটিয়া আসিল।

বাবা! বাবা!

হাঁপাইতেছে। একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল, কে এসেছে দেখে যাও বাবা—

কে ?

তার আগেই কীর্তিনারায়ণ উঠিয়া আসিল। নরহরির মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এস বাবা, এস—

কি অদ্ভুত কঠোরতা কিশোর কচি মুখখানার উপর! নরহরি বলিলেন, বোসো—

তেজি ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকাইয়া কীর্তিনারায়ণ দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল, নেমন্তন্ন খেতে আসি নি চৌধুরি মশায়। আপনাদের নেমন্তন্ন করতে এসেছি।

নরহরি চমকিয়া চাহিলেন। বউভাসির চকের দিক দিয়া ধোঁয়ার কুণ্ডলী আর মাঝে মাঝে অগ্নিশিখা দেখা যাইতেছে। কীর্তিনারায়ণ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, আমাদের লোকজন পৌঁছে গেছে তা হলে। চুরি করে রাতারাতি

যে কাছারিঘর বেঁধেছিলেন দিনের বেলা সকলের মুকাবেলা ঐ দেখুন তা পোড়ানো হচ্ছে।

নরহরি কীর্তিনারায়ণের দিকে ভ্রূকুটি করিলেন।

বিশ্বাস করি না। আবার একনজর অগ্নিকাণ্ডের অভিমুখে চাহিয়া ব্যঙ্গের স্বরে তিনি বলিলেন, বরণডাঙার দল খোলে হরেকৃষ্ট আওয়াজ তুলতে পারে—এই তো জানি। সেই হাতে ঘরে আগুন দিচ্ছে, এ আমার কিছুতে বিশ্বাস হয় না বাবা। আগে টের পেলে জায়গায় গিয়ে দেখে আসতাম, সত্যি হলে ঘোষ-গিন্নির উদ্দেশে নমস্কার করে আসতাম খেয়াঘাটে দাঁড়িয়ে।

কীর্তিনারায়ণ বলে, দেখবার অনেক আছে এখনো। একলা নয়—ঢালিদের সঙ্গে নিয়ে দল বেঁধে দু-চোখ ভরে দেখুন গে। বউভাসির চকের বাঁধ কাটবে এইবার আমাদের লোকেরা। জোয়ারের জন্য দেরি করছে, কোদাল হাতে বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

স্তম্ভিত নরহরি বলিলেন, বাঁধ কেটে চক ভাসিয়ে দেবে আর অত ক্ষতি-লোকসান চোখ মেলে শুধুই আমরা দেখে আসব, এই মনে করেছ নাকি?

কীর্তিনারায়ণ বলিল, ক্ষতি-লোকসান অনেক হবে, তা ঠিক। কিন্তু ধান রোওয়ার মুখেই এই ব্যাপার, কাটবার সময়ও না জানি আরও কত নতুন নতুন উৎপাত আমদানি করবেন! ভেবে চিন্তে এবারের মতো তাই চক ভাসিয়ে দেওয়া সাব্যস্ত করা গেল।

এমন ভঙ্গিতে কথা বলিতেছে যেন সে নরহরিরই প্রায় একবয়সি সমান প্রতিপক্ষ। রাগের চেয়ে কৌতুকই বেশি লাগিতেছে নরহরির। বলিলেন, চকটা কি তোমাদের?

আপনি কি জানেন না চৌধুরি মশায়?

আমি জানলে হবে কি? আদালত কি বলেছে?

আপনারা যেমন বলে এসেছেন, সেই সব শুনেই তো আদালতের বলা।

আদালত যা খুশি বলুক গে, আমাদের যা বলবার বাঁধের উপর দশগ্রামের মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে বলে যাব। নেমন্তন্ন করে যাচ্ছি, উৎসবের হৈ-চৈর মধ্যে ঠিক সময়ে পাছে খবরটা না পৌঁছয়।

বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু তার আগেই নরহরি বাহির হইয়া দরজায় শিকল তুলিয়া দিলেন।

কীর্তিনারায়ণ দরজায় লাথি দিয়া বলিল, কায়দায় পেয়ে আটকালেন ?

নরহরি বাহির হইতে বলিলেন, পুরানো অভ্যাস বাবা। তোমার বাপকে আটকে রেখেছিলাম, শোন নি ?

কেমন এক ধরনের হাসি হাসিয়া পুনশ্চ বলিলেন, দলিল-দস্তাবেজ জাল করে হলপ পড়ে মিথ্যে বলে এসে যারা ডঙ্কা মেরে বেড়াচ্ছে, তাদের গহ্বরে পা দিতে এলে তুমি কোন বিবেচনায় ?

মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল—বাঘের গহ্বরে। কথাটা ব্যঙ্গের মতো শোনাইবে বলিয়া নরহরি সামলাইয়া লইলেন।

সুবর্ণকে নরহরি চুপিচুপি বলিলেন, বাঁধে চললাম। দরজা খুলে দিস না কিন্তু, খবরদার ! লাঠির আগে মাথা বাড়িয়ে দেবে ও-ছেলে—মারা পড়বে।

সুবর্ণলতা কোন সময়ে নামিয়া গিয়া ডিঙা হইতে একরাশ পদ্ম লইয়া আসিয়াছে, অলিন্দে বসিয়া তাহারই মালা গাঁথিতেছিল। সে ঘাড় নাড়িল।

কাছারিঘর জ্বালাইয়া দিয়া চিন্তামণির দল খাল-ধারে বাবলা-ছায়ায় বসিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছে। কোদালিরা বাঁধের উপর। সেখানে গাছপালা নাই—রোদ আজ প্রখর নয়, তাই রক্ষা। জোয়ার আসিয়া গেল, ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে চিন্তামণিরা। ক্ষণে ক্ষণে তারা জকার ছাড়িতেছে। ছোকরাদের মধ্যে বেশি উৎসাহী কয়েক জন বারম্বার উঠিয়া একরশি দু-রশি আগাইয়া উঁকি-

ঝুঁকি দিয়া দেখিতেছে। কিন্তু শ্যামগঞ্জের জনপ্রাণী কেহ এখনো নজরে পড়িল না।

আসিতেছে এতক্ষণে, অবশেষে আসিয়া পৌছিল। বাঁধের পথে নয়—জলপথে, খালের উপর দিয়া। প্রবল জোয়ারের বেগে পাঁচখানা বড় ডিঙি চকের বাঁধের গায়ে লাগিতে না লাগিতে ঢালিরা হৈ-হৈ করিয়া নরম কাদায় লাফাইয়া পড়িল। চিন্তামণির দলও লাঠি উঁচাইয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঝপ্‌পাস করিয়া বাঁধে একসঙ্গে দশখানা কোদাল পড়িল। এই সময় রোদ ফুটিল, উদ্যত বল্লমের ফলায় রোদ পড়িয়া ঝকমক করিয়া উঠিল। তীরের মতো ঘোড়া ছুটাইয়া নরহরি চৌধুরি ওদিক দিয়া আসিয়া পড়িলেন। অনেকদিন পরে আজ আবার রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। বুড়া হইয়াছেন, এবং এক চিন্তামণি ছাড়া লাঠি-সড়কিতে জেলার মধ্যে তাঁর জুড়ি নাই। কিন্তু যৌবনের গতিবিধি নিগূঢ় অন্ধকার পথে চলিয়াছিল, উন্মুক্ত আলোয় প্রকাশ্য সংগ্রামের এই অভিজ্ঞতা তাঁর পক্ষে নূতন বলিলেই হয়। শিবনারায়ণের সঙ্গে বন্ধুত্ব হইলে বড় আশা হইয়াছিল, এই বিষয়ে নব দীক্ষা লইবেন—দুই বন্ধু কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া সারা অঞ্চল তোলপাড় করিয়া তুলিবেন। কিন্তু শিবনারায়ণের তখন মত ঘুরিয়া গেছে। এতকাল পরে চিরদিনের মতো চোখ বুঁজিবার আগে বোধকরি আজ এই একটি দিনের জন্য, বন্ধু এখন আর নয়—শত্রুপক্ষের মুখোমুখি দাঁড়াইবার সুযোগ হইল। পাশাপাশি দাঁড়াইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, শেষ অবধি মুখোমুখি দাঁড়াইতে হইল।

শ্যামগঞ্জের তুলনায় বরণডাঙার দল সংখ্যায় নগণ্য। কিন্তু কোদালিদের আগলাইয়া চিন্তামণি ও তার সাকরেদরা লোহার প্রাচীরের মতো দাঁড়াইয়াছে। ইহার সামনে শ্যামগঞ্জের ঢালিরা থমকিয়া দাঁড়াইল। ঝপাঝপ কোদাল পড়িতেছে, খালের জল চকে ঢুকিবার একটুকু পথ পাইয়া গেলে রক্ষা থাকিবে না। নরহরি গর্জন করিয়া উঠিলেন, রঘুনাথ সর্দার!

রঘুনাথ পিছন ফিরিয়া তাঁর দিকে চাহিল। সে মুখে কি দেখিতে পাইল সে-ই জানে—ইহাদের প্রথা মতো লাঠি উঁচাইয়া সম্ভাষণ করিল ওস্তাদ চিন্তামণিকে। চিন্তামণিও প্রত্যুত্তর দিল। তারপর বাঘের মতো দু-পক্ষ পরস্পরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। চিন্তামণির হাতের লাঠি দুই খণ্ড হইয়া গেল। অনেক কালের অব্যবহার—ঘুন ধরিয়া গিয়াছিল বোধ হয়। লাঠির টুকরা চিতলমারির স্রোতে মুহূর্তমধ্যে অদৃশ্য হইল। ক্ষতবিক্ষত চিন্তামণিও ঝোঁক সামলাইতে পারিল না, জলে পড়িল।

আহা-হা!

হাতের বল্লম ফেলিয়া দিয়া রঘুনাথ ওস্তাদকে ধরিতে গেল। বরণডাঙার লোক ইতিমধ্যে এদিকটা একেবারে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, রঘুনাথেরই বল্লম কে-একজন ছুড়িয়া মারিল। ফলার অর্ধেকখানি হাঁটুর নিচে গেল বিঁধিয়া। রক্তচক্ষে তীরবর্তী মানুষগুলার দিকে চাহিয়া রঘুনাথ বল্লম টানিয়া উপড়াইল। ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিয়াছে। তীব্র স্রোতে চিন্তামণির অসাড় দেহ পাক খাইয়া ডুবিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। রঘুনাথ সাঁতরাইয়া ধরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ক্ষমতা নাই। যন্ত্রণা-বিকৃত মুখে অবশেষে খালের ধারে জলকাদার উপর সে বসিয়া পড়িল।

লাঠির টুকরার সঙ্গে চিন্তামণিও কোন দিকে ভাসিয়া গিয়াছে। বরণডাঙার দশ-বারো জন খালের জল তোলপাড় করিয়া তার খোঁজ করিতেছে। নরহরি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, আটকাও ওদের—একটা প্রাণী ও-পারে ফিরে যেতে না পারে!

কিন্তু কণ্ঠস্বরে নিজেরই লজ্জা হইল। গলার জোর নাই। ঢালিরা হতভম্ব হইয়া তাঁর দিকে তাকাইয়া আছে। ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া বিরুদ্ধ-দলের লাঠিয়ালদের ধরিয়া ফেলিবার উৎসাহ নাই কারও। নরহরির কণ্ঠে যেন ভাঙা-কাঁসরের আওয়াজ বাহির হইতেছে—আগেকার গাম্ভীর্য, লোকের মনে ত্রাস জাগাইবার সে সামর্থ্য আর নাই। বউভাসির চকের ভিতর কলকল্লোলে জোয়ারের লোনা

জল ঢুকিতেছে। বাঁধের উপর যে নালা কাটিয়া দিয়াছে, ভাঙিয়া চুরিয়া দেখিতে দেখিতে তাহা সুপ্রশস্ত হইয়া গেল। নরহরি দেখিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর একজনের নজরে পড়িল, দুই বাঁক দূরে কেয়াঝাড়ের শিকড়ের জালে চিন্তামণি আটকাইয়া আছে। সন্তর্পণে শবদেহ তুলিয়া ধরিয়া সাঁতার কাটিয়া সাকরেদরা বরণডাঙার পারে নামাইল। চক্ষু মুদ্রিত, ক্লান্ত বৃদ্ধ যেন ঘুমাইয়া আছে। দু-চোখের দৃষ্টি বিসারিত করিয়া নরহরি এপার হইতে দেখিতে লাগিলেন।

আর সেই সময় শ্যামগঞ্জের পাষাণ-কক্ষের ভিতর কীর্তিনারায়ণ ছটফট করিতেছে। নরহরি ফিরিয়া আসিয়া দরজা খুলিলেন, তখন দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে। দাঙ্গার বৃত্তান্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে, উৎসব-কোলাহল স্তব্ধ হইয়াছে। কীর্তিনারায়ণ কিছু জানে না। বাহিরে আসিয়া দেখিল, তার জন্য স্নানের জল তুলিয়া রাখিয়াছে—সুবর্ণলতা তাড়াতাড়ি তেল-গামছা আগাইয়া আনিল। সে দাঁড়াইল না, ধাক্কা দিয়া সুবর্ণকে সরাইয়া দিয়া দ্রুতপায়ে চলিয়া গেল।

আবার নূতন মামলা দায়ের হইল—ফৌজদারি। দাঙ্গা ও খুন-জখমের ব্যাপার—সরকার-পক্ষ বাদী এবার। অনেক তদ্বির হইল, জলের মতো অর্থব্যয় হইল। বোধকরি তারই ফলে আসামীদের তেমন গুরুতর দণ্ড হইল না—তিনমাস হইতে তিন বৎসর অবধি জেল। নরহরিরই কেবল সাত বৎসর। ক'জনে ছাড়াও পাইয়া গেল। খোঁড়া পা লইয়া মনিবের পিছু পিছু রঘুনাথ জেলে ঢুকিল। বাঘা চৌধুরিকে জেলে পুরিবে, এ অঞ্চলের কেউ কোনদিন ইহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই।

আবার একদিন নরহরি জেলের বাহিরে আসিলেন। শ্যামকান্ত ফটকে অপেক্ষা করিতেছিল। বিশীর্ণ চেহারা, অন্ধকার মুখ, চলিতে গিয়া পা টলে—কে বলিবে, এই বাঘা চৌধুরির নামে একদা মালঞ্চের তীরবর্তী অঞ্চল সন্ত্রস্ত থাকিত।

বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া নরহরি চিনিতে পারেন না, বছর সাতেকের মধ্যে এমন পরিবর্তন! সে আমলের সদর-বাড়ি এখন পিছনে পড়িয়াছে, বাড়ির মুখ অন্যদিকে। নাককাটির খালের পাশ দিয়া নূতন এক পাকা-রাস্তা মালঞ্চের খেয়াঘাটে গিয়াছে। রান্নাবাড়ি ভাঙিয়া দিয়া বাদামবন কাটিয়া পাকা-রাস্তার ধারে সদর হইয়াছে এখন। হাল আমলের হালকা দালান-কোঠা উঠিয়াছে—নূতন পাঁজার পুরু ইটে গাঁথা পাতলা দেয়াল। একদিকের দু-তিনটা ঘরে শ্যামকান্তর আফিস ও খাস-কামরা—চেয়ার টেবিল শৌখিন দেয়ালগিরি আর টানাপাখায় কেতাদুরস্ত ভাবে সাজানো। অপর দিককার ঘরগুলায় জমিদারি সেরেস্তা। সেখানে সাবেক রীতিতে ফরাসের উপর হাতবাক্স সামনে লইয়া আমলারা কাজকর্ম করিতেছে বটে, তবে কাছারি সকাল-বিকাল না হইয়া দশটা-পাঁচটায় বসিয়া থাকে।

নরহরি মোটে সোয়াস্তি পাইতেছেন না। মনে হইতেছে, কোন জায়গা হইতে একদিন বিদায় লইয়াছিলেন—আর এ কোথায় ফিরিয়া আসিলেন? স্থবর্ণলতাকে নরহরি লাঠি শিখাইতেন—রঘুনাথ আগে ছাড়া পাইয়া আসিয়া মনিবের সেই কাজের ভার লইয়াছে। রোজ বিকালে আসিয়া লাঠি শেখায়। শ্যামকান্ত আপত্তি করে নাই, স্থবর্ণলতার সম্পর্কে নরহরির যেরূপ অভিপ্রায়, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সে ভরসা পায় না। প্রয়োজনও বোধ করে না।

হাতে খড়ি নয়—হাতে লাঠি লইয়া এই নরহরিদের শিক্ষা শুরু হইয়াছিল। শ্যামকান্তর বিষয়ে নরহরি নিজের মতলব খাটাইতে পারেন নাই—কতকটা ঐ সময়ে নৌকাবক্ষে খালে বিলে ঘোরাঘুরি করিতে হইত বলিয়া, আর কতকটা শিবনারায়ণের প্রভাবে পড়িয়া। মেয়ের বেলা ঐ সব অসুবিধা আর ছিল না।

অপরাহ্ণে বসিয়া বসিয়া তিনি সুবর্ণলতার লাঠিখেলা দেখিতেছিলেন। খোঁড়া রঘুনাথ, সে লড়িতে পারে না—কেবলমাত্র কায়দাটা দেখাইয়া দেয় আর মুখে মুখে নির্দেশ দান করে। খেলা করে রঘুনাথের মেয়ে যমুনা আর সুবর্ণলতা। দেখিয়া দেখিয়া নরহরির কৌতুক লাগে; মনের গ্লানি মুছিয়া যায়। এতক্ষণে শ্যামগঞ্জের ভিতর একটুখানি যেন নিজের জায়গা খুঁজিয়া পান। খেলার পরই সন্ধ্যার আগে অন্যান্য দিন রঘুনাথ যমুনার হাত ধরিয়া ঢালিপাড়ায় চলিয়া যায়।

আজ খেলার পর তারা চলিয়া যাইতে পারিল না, নরহরি সকলকে লইয়া মহাকালীর মন্দিরে আরতি দেখিতে গেলেন। দীর্ঘ ঘাস জমিয়াছে উঠানে; তাহার মধ্য দিয়া সরু একপেয়ে পথ সিঁড়ি অবধি গিয়াছে। আমের ডাল ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে মন্দিরের চূড়ার উপর; ডাল হইতে গুলঞ্চলতা নামিয়া আসিয়াছে। হতশ্রী চেহারা। দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, মানুষজন এদিকে বড় একটা আসে না—সেরেস্তার ব্যবস্থা মতো পুরোহিত আসিয়া কোনরকমে পূজার নিয়ম-রক্ষা করিয়া যান।

অম্বুবাচী লাগিয়াছে, নরহরির খেয়াল ছিল না। দৈবাৎ জানিতে পারিলেন। কি কাজে কাছারিঘরের দিক দিয়া যাইতেছিলেন, বারাণ্ডায় চাষী-প্রজাদের ভিড়। সেরেস্তা ছাড়িয়া মালাধর বাহির হইয়া আসিয়াছিল। তাকে ঘিরিয়া প্রজারা বলিতেছিল, অম্বুবাচীতে চাষ বন্ধ—তাই এত লোক তারা একত্র হইয়া আসিতে পারিয়াছে; মালাধর আজকেই যেন দয়া করিয়া হুজুরে হাজির হইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। দয়াটা যে নিতান্ত অহেতুকী হইবে না, মালাধরের চাপা কথাবার্তার মধ্যে তাহা বেশ প্রকট হইতেছে।

লোনা লাগিয়া গত বৎসর ফসল হয় নাই, লোকগুলা কিছু পরিমাণ খাজনা মকুবের দরবারে আসিয়াছে। নরহরি উদাসীন তৃতীয় পক্ষের মতো পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া শুনিয়া আসিলেন।

নরহরি রঘুনাথকে বলিলেন, অম্বুবাচীর খবর রাখ সর্দার?

রঘুনাথ ঘাড় নাড়িল।

কই, টের পাচ্ছি না তো তোমাদের ভাবগতিক দেখে—

ভারি গলায় রঘুনাথ বলিল, সে সব রেওয়াজ উঠে গেছে চৌধুরি মশায়। কেউ আসে না, কারও আর ওসব দিকে ঝোঁক নেই। নইলে বোঠে বাইতে বাইতে হাত ব্যথা হয়ে যেত না এতক্ষণ?

সেই সব দিনের কথা নরহরির মনে পড়ে—যেন গতজন্মের কথা। অম্বুবাচীর প্রথম দিন নৌকা-বাইচ হইত। এক এক গ্রামের এক এক নৌকা—আট-দশ ক্রোশ দূর হইতেও নৌকা আসিত। পাল্লার নৌকা ছাড়া বাইচ দেখিবার জন্যও অনেকে আসিত, নৌকায় নৌকায় মালঞ্চের জল দেখিবার জো থাকিত না। নদীর দু-পারে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করিয়া দাঁড়াইত। চিতলমারির মোহানা হইতে পাল্লা শুরু হইত। নাককাটির খালের মুখ ছাড়িয়া আরও প্রায় ক্রোশখানেক আগাইয়া গরিব-কালীবাড়ি নামক এক জায়গা—বিচারকেরা সেইখানে বড় বড় বাচাড়ি-নৌকা নোঙর করিয়া এ-নৌকা ও-নৌকার মধ্যে কাছি টাঙাইয়া অপেক্ষা করিতেন—কারা আগে আসিয়া বৈঠা দিয়া সেই কাছি স্পর্শ করিতে পারে!

শ্যামগঞ্জের বাইচ-ডিঙিতে নরহরি নিজে উঠিয়া বসিতেন। বৈঠা ধরিতেন না —মাঝখানে দাঁড়াইয়া দু-হাত আন্দোলিত করিয়া জোরে বৈঠা বাহিতে সকলকে উৎসাহ দিতেন। সেদিন তিনি নূতন কাপড়-চাদর পরিয়া আসিতেন—সেই কাপড়-চাদর মাঝি বখশিশ পাইত। আর সকলে পাইত একখানি করিয়া গামছা। বাইচে হারুক কিম্বা জিতুক, চৌধুরির এ বখশিশ তারা পাইবেই। এ ছাড়া

বিজয়ী দলের জন্য থাকিত সুবৃহৎ একটি পিতলের ঘড়া, আর দলের প্রত্যেকের জন্য এক একখানি নূতন উড়ানি।

দ্বিতীয় দিন চরের উপর ঢালিরা কুস্তি লড়িত, ঢালিখেলা ও লাঠিখেলা করিত। নরহরি তাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। সে একদিন গিয়াছে!

নরহরি প্রশ্ন করিলেন, কালকেও এমনি ঘরকুনো হয়ে থাকতে হবে নাকি? না—না—না, এক্ষুণি তুমি চলে যাও সর্দার, পাড়ায় যারা আছে তাদের বল গিয়ে। গাঙ-পারে লোক পাঠিয়ে দাও। চণ্ডীদ'র চরে সবাই এসে কাল যেন জমায়েত হয়।

আপনি চরে যাবেন চৌধুরি মশায়?

হ্যাঁ—

লাঠি ধরবেন আপনি?

নরহরি ঘাড় নাড়িলেন। হাসিতে রঘুনাথের মুখ ভরিয়া গেল। তা হলে মানুষ-জন দেখবেন কি রকম ভেঙে এসে পড়ে! এবারে বরণডাঙা কানা হয়ে যাবে।

নরহরির চমক লাগিল। ঘোষ-গিন্নি এই দিকে ঝুঁকিয়াছেন নাকি? শিবনারায়ণের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, সুমতি হইয়াছে তাঁর স্ত্রী-পুত্রের?

তারপর যেন অনেকটা নিজের মনেই বলিলেন, তবে আর বউভাসি ছেড়ে দিল কেন এত সহজে?

কিন্তু সৌদামিনী নহেন। কীর্তিনারায়ণ বড় হইবার পর তিনি ধর্মকর্মে মন দিয়াছেন, সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক এখন নিতান্ত যেটুকু নহিলে নয়। বিষয়-আশয় যে ক্রমশ হস্তচ্যুত হইতেছে, তা অনেকটা তাঁর ঐ উদাসীনতার জন্যই। লাঠিখেলার উদ্যোগ-আয়োজন সমস্ত কীর্তিনারায়ণের। ভানুচাঁদটা আবার ওপারে গিয়া জুটিয়াছে, দু-জনে বড় মিলিয়াছে, অহরহ তারা এইসব লইয়াই আছে।

মাটিতে থুতু ফেলিয়া রঘুনাথ বলিল, দল ছেড়ে ভানু ওপারে গিয়ে উঠেছে। আমরা ফিরে আসব, সে ক'টা দিনও সবুর করল না হতভাগা।

কিন্তু আশ্চর্য, নিজ দলের ঢালির এমন দুষ্কার্যে নরহরি রাগ করিলেন না। বলিলেন, দল আর রয়েছে কোথায়, যে দল ছাড়বার কথা উঠবে ? এপারে পড়ে থাকলে শুধু লাঠি নয়, হাতেও ঘুন ধরে যেত। কাঁচা বয়স—পারবে কেন টিকে থাকতে ?

একটু হাসিয়া কৌতূহলের স্বরে প্রশ্ন করিলেন, ভানুচাঁদ খুব আজকাল মাতব্বরি করে বেড়ায় বুঝি ? বন-গাঁয়ে শিয়াল-রাজা হয়েছে ?

রঘুনাথ ঘাড় নাড়িয়া বলে, কার কাছে মাতব্বরি করবে, কে মানতে যাচ্ছে ওকে ? বাপের বেটা কীর্তিনারায়ণ। সাকরেদের হাতে সার্থক লাঠি তুলে দিয়েছিল চিন্তামণি-ওস্তাদ। এক একদিন ভানুচাঁদকে উনি নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে দেন। আমি এপার থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, দেখে আর পলক ফেলতে ইচ্ছে করে না।

সাবেক কালের মতো ঢালিদের মধ্যে বাঘা চৌধুরি নিজে লাঠি ধরিয়া দাঁড়াইবেন—বার্তা লইয়া রঘুনাথ পরমোৎসাহে ছুটিল। ঢালিপাড়া হইতে নানা দিকে দলবল পাঠাইয়া দিল। কিন্তু পরদিন যথাকালে চরে আসিয়া দেখা গেল, লোকজন সামান্যই আসিয়াছে। লাঠি খেলিবার জন্য রঘুনাথ যাদের জোগাড় করিয়া আনিয়াছে, লাঠি ভর দিয়া আছে তাই রক্ষা—লাঠি কাঁধে তুলিতে গেলে সেই ভারেই বোধকরি মাটিতে পড়িয়া যাইবে। যারা দেখিতে আসিয়াছে, তারাই এইসব বলিয়া হাসাহাসি করিতে লাগিল।

ওপারে বড় জমজমাট। পিঁপড়ার সারির মতো বাঁধ ধরিয়া মানুষ গিয়া জমিতেছে। নরহরি এপারের দর্শক ক'টির উদ্দেশে বলিলেন, তোমরাও চলে যাও বাপসকল, সাঁকো পার হয়ে তাড়াতাড়ি জায়গা নাওগে। আমরা চেষ্টা করে দেখলাম, পেরে উঠলাম না। কেউ চায় না আমাদের, দেখতেই পাচ্ছ।

রঘুনাথ করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। নরহরি হাসিলেন—কান্নার মতো করুণ হাসি। বলিলেন, নদীর এক কূল ভাঙে আর এক কূল গড়ে—নিশ্বাস ফেলে কি হবে ? ভাঙা-কূল আগলে দাঁড়িয়ে থাকতে আমারও ভাল লাগছে না

রঘুনাথ। যদি বয়স থাকত, তা হলে ওদের ঐ নতুন কূলে ভানুচাঁদের মতোই গিয়ে নতুন ঘর বাঁধতাম।

ওপারেই তিনি চলিয়া গেলেন। শিবনারায়ণের বাড়ির সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন। খবর পাইয়া সৌদামিনী আসিয়া বলিলেন, ঠাকুরপো, বাড়ি ঢুকলে না, অতিথ-অভ্যাগতের মতো মন্দিরের চাতালে বসে পড়েছ। রাগ পুষে রেখেছ এখনো এদ্দিন পরে?

নরহরি বলিলেন, রাগ-অভিমানের ও-পারে আজকে আমি বউঠান। সন্দেহ হচ্ছে, আমার মৃত্যু হয়ে গেছে।

একটু থামিয়া ম্লান হাসিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, জেলে গিয়েছিলাম—সে অপমান দু-দিনে জুড়িয়ে যেত। কিন্তু বেরিয়ে এসে দেখছি, শ্যামগঞ্জ আলাদা রকমের হয়ে গেছে। সারা জীবন কাটিয়ে সাত বছরের ফাঁকে সমস্ত আনকোরা নতুন লাগছে। বিকালবেলা খাল-পার থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে আপনার কীর্তিকে দেখছিলাম। কি হাত খুলেছে মরি মরি! আমার চেনা মানুষ, চেনা দলবল আবার যেন দেখতে পেলাম আজ চারদিন পরে। স্থির থাকতে পারলাম না বউঠান, সাঁকো পেরিয়ে পায়ে পায়ে আপনার বাড়ি চলে এসেছি।

সেই রাতে নরহরি বরণডাঙায় থাকিয়া গেলেন সৌদামিনীর আগ্রহাতিশয্যে। পুরানো দিনের অনেক কথাবার্তা হইল। খাল মজিয়া আসিতেছে। এখন আর খেয়ানৌকার প্রয়োজন হয় না, বাঁশের সাঁকোয় পারাপার চলিয়া থাকে। প্রহরখানেক রাত্রে মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্না উঠিল। চারিদিককার মাঠ, গাছপালা, নিযুপ্ত খোড়োঘর, রূপার পাতের মতো দূর-বিস্তৃত মালঞ্চের জলধারা বড় অপরূপ দেখাইতে লাগিল। জ্যোৎস্নার আলোয় দেখা গেল, অতিথিশালার দাওয়ায় মানুষগুলা শুইয়া বসিয়া অলস বিশ্রামে গল্পগুজব করিতেছে। অনেক দিন আগেকার সুপরিচিত দৃশ্যগুলি—নরহরির অন্তরতল অবধি আনন্দে আলোড়িত হইয়া উঠিল। মৃত্যুলোক হইতে জীবন-রাজ্যে ফিরিয়া আসার আনন্দ।

আহারের জায়গা হইয়াছে। নরহরি বলিলেন, খেতে বসব বউঠান, তার আগে একটা প্রার্থনা মঞ্জুর করতে হবে। নিতান্ত বেহায়া বলেই মুখ ফুটে বলতে পারছি। অনুমতি দিন—কীর্তিনারায়ণের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে আপনার পাদপদ্মে এনে রেখে যাই।

স্বর্ণলতা? সৌদামিনী আশ্চর্য হইয়া বলিতে লাগিলেন, বলেন কি চৌধুরি ঠাকুরপো? কত গরিব আমরা আপনার তুলনায়।

হাতজোড় করিলেন নরহরি। বুড়া হইয়া একি অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে বাঘা চৌধুরির?

সৌদামিনী বিহ্বল কণ্ঠে বলিলেন, পায়ে রেখে যাবার কথা-টথা খবরদার আর মুখ দিয়ে বের করবেন না ঠাকুরপো। স্বর্ণ কি আমার হেলাফেলার ধন? সত্যি সত্যি যদি এত বড় অনুগ্রহ করেন, মালতীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে বুকখানা জুড়ে থাকবে আমার মা-লক্ষ্মী।

(২৮)

সেদিন ঘড়িতে দশটা বাজিতেই নরহরি সেরেস্তায় ফরাসের উপর চাপিয়া বসিলেন। নানা খবরাখবর লইলেন, খুব হুকুম ছাড়িতে লাগিলেন। ঢালিপাড়ায় তিনজন বরকন্দাজ পাঠাইয়া দিলেন, পাড়ার সকলকে এখনই ডাকিয়া আনিতে হইবে।

ঢালিরা আসিয়া পৌঁছিলে নরহরি শ্যামকান্তকেও ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইঙ্গিতে ঢালিদের কাছে আসিয়া বসিতে বলিলেন। জীবন-মরণ সন্ধিপথে অনেক কালের সহযাত্রী শিথিল ন্যুব্জদেহ এই মানুষগুলিকে গভীর দৃষ্টিতে তিনি দেখিতে লাগিলেন। পরমাত্মীয়দের কতদিন এমন ভাবে দেখেন নাই। সহসা প্রশ্ন করিলেন, ইনাম পাস নি তো তোরা?

নরহরি কি বলিতে চান, না বুঝিয়া তারা ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইল। নরহরি হাসিয়া বলিলেন, তোরা বেকুব—মুখ ফুটে কোনদিন কিছু চাইতে শিখলি

নে। কিন্তু আমারই কর্তব্য এটা—তোরা না চাইলেও আমাকে পাইয়ে দিতে হবে।

শ্যামকান্ত আসিলে বলিলেন, বসত-ঘর ভেঙে এনে দিয়েছিল রঘুনাথ; সবাই এরা লাঠি খেয়েছে, হাত-পা ভেঙেছে, জেলে পচেছে—এদের ক্ষতি-পূরণের ব্যবস্থা কি করেছ শ্যামকান্ত?

শ্যামকান্ত মুখ নিচু করিল। এত মানুষ—সবাই চুপচাপ, নরহরির মুখের দিকে চাহিয়া বাক্‌শক্তি হঠাৎ যেন বিলুপ্ত হইয়া গেছে। নরহরি উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, বউভাসির চকের সমস্ত জমি আমি তোদের দিয়ে দিলাম।

সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। চকের ভিতর জমি দু-হাজার বিঘার কম নয়। উহার জন্য এত দাঙ্গাহাঙ্গামা, খুনজখম—নরহরিকে জেলে পর্যন্ত যাইতে হইল। জেল হইতে নরহরি মাথা খারাপ হইয়া ফিরিয়াছেন নাকি?

শ্যামকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, যত জমি—সমস্ত দিলেন?

সমস্ত। ওরা অনেক দিয়ে এসেছে আমাদের—এই বাড়ি যেদিন এসে দখল করলাম, সেই তখন থেকে। জন প্রতি দশ-পনের বিঘে না হলে কাচ্চা-বাচ্চা মা-বউর পেট ভরাবে কিসে? আর পেটও ওদের এক একটা ঢাকাই জালা—খাইয়ে দেখলে না তো কোন দিন! আমি দেখেছি।

নরহরি হাসিয়া উঠিলেন। ঢালিদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কাজ থাকল না তোদের আর কারও। আর কোন দিন চৌধুরি-বাড়ি ডাক পড়বে না। আমি হেরেছি, হেরে গিয়ে এতকাল জেলে পচে এলাম সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে—

হাসিয়া অনেকটা যেন নিজের মনে বলিতে লাগিলেন, শিবনারায়ণ আমাদের গালি দিত, ব্রতচ্যুত আমরা। কে কানে নিল তার কথা? সেই তো হারল সকলের আগে। এবার আমরাও সরে যাচ্ছি। শ্যামকান্তর জিত—ওদের কাল, ওরাই জিতুক। শুনলি তো? তোরা এখন সব শিষ্টশান্ত হয়ে চকের জমি চষবি, খাবি-দাবি, থাকবি—

প্রজাপাটক এবং বাহিরের যত লোক উপস্থিত ছিল, সকলে নরহরির আকাশ-ফাটানো জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

গোলমাল থামিলে আবার নরহরি বলিতে লাগিলেন, দিনকাল বদলে গেছে রে, আইন বড্ড কড়া। গাঙে গাঙে বেড়ানো কি দাঙ্গা-ফ্যাসাদে ঝাঁপিয়ে পড়া আর চলবে না। ভালমানুষ হতে হবে।

ঢালিরা বলে, গোলা থেকে ধান পাঠানো বন্ধ হল তা হলে চৌধুরি মশায়?

নরহরি ঘাড় নাড়িলেন। বলিলেন, এখনই কি পেয়ে থাকিস নিয়ম মতো?

ছিলাম ঢালি, আমাদের পুরোপুরি চাষা বানিয়ে দিলে?

এমন হইল, কেহ আর চোখের জল রাখিতে পারে না। সকলের হইয়া গেলে নরহরি রঘুনাথকে ডাকিলেন, শোন সর্দার, কাছে এস—

ডুবন্ত মানুষ তীরের তৃণমুষ্টি যেভাবে চাপিয়া ধরে, নরহরি তেমনি ভাবে রঘুনাথকে বুকে টানিয়া লইলেন।

তুমি হলে সর্দার, বন্দোবস্ত আলাদা তোমার সঙ্গে। লাঠি ধরে একলা বিশ-জনের মহড়া নিতে পার, ঢাল-সড়কি নিয়ে দু-শ লোকের ব্যূহ ফুঁড়ে বেরোও, জোয়ারের মালঞ্চ হাসতে হাসতে সাঁতরে পার হয়ে যাও, রাতের মধ্যে আটচালা কাছারিঘর উড়িয়ে এনে চকে বসাও—জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু আমি তোমায় কয়েদ করে রাখলাম।

ম্লান হাসি হাসিয়া রঘুনাথ বলিল, আমার নতুন ঘর-দুয়োর আর হল না তা হলে?

ছাড়বই না মোটে, ঘরের গরজটা কি? দু-জন আমরা সেকালের সাথী একসঙ্গে থাকব। আমি যা খাব, তুমি তাই খাবে। যদি কোথাও যাই, তুমি থাকবে সঙ্গে। যেদিন চোখ বুঁজব, ছুটি সেই দিন—তার আগে নয়। একেবারে একা পড়ে গেছি, একজন কাউকে না পেলে থাকি কি [illegible]

বলিতে বলিতে কেউ যাহা কোন দিন দেখে নাই—[illegible]-ফোঁটা [illegible] বাঘা চৌধুরির কপোল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল।

শেষ